শিব্রাম্ চকর্ক্করবর্তির মতো কথা বলার বিপদ !

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

দি বুক এম্পরিয়ম লিমিটেড
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৫২,

দাম—এক টাকা চার আনা

দি বুক এম্পরিয়ম লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২২।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট,
দি প্রিন্টিং হাউসের পক্ষে মুদ্রাকর পুলিনবিহারী সামন্ত, ৭০ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা।

স্নেহের

শর্ম্মিষ্ঠা, শমিতা

গোপাল আর গীতা

এবং শ্রীমতী মিনিকে

এই বইয়ের

রূপকার

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

প্রয়োগশিল্পী

শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ



শিব্রাম্‌ চক্‌র্‌বর্‌তির মতো
কথা বলার বিপদ!

আর কিছু না, বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে' বল্লেচি খালি : "চা খাও আর না খাও, আমাকে তো চাখাও!"

অম্নি দোকানের ও-কোণ থেকে কে যেন তার কাণ খাড়া করল, ছোট্ট একটি ছেলে, আমি লক্ষ্য করলাম।

"দূর! এই অবেলায় এখন চা খায়? শুদ্ধু এক গ্লাস জল—আর কিছু না!" বন্ধুর জবাব এলো : "আর—আর না হয় ওই সঙ্গে একখানা বিস্কুট্! ভাগাভাগি করেই অবিশ্যি।"

"ভারী যে নিরাসক্তি! না বাপু, আধখানা বিস্কুটে আমার লোভ নেই, আর নীরেও আমার আসক্তি নেই তুমি জানো। আমার চা-ই চাই!"

কাণ-খাড়া-করা ছেলেটি এবার বলে' উঠল : "য়্যাঁ, কি বল্লেন?"

"তোমাকে তো কিছু বলিনি ভাই!" আমি বল্লাম : "আমি বক্‌চি এই—এই পাশের—আমার পাশের—কী বল্‌ব একে? এই পার্শ্ববর্ত্তীকে।"

"আপনি শিব্রাম্ চকর্‌বরতির মতো কথা বল্লেন না?"

"য়্যাঁ? কার মতো কথা বল্লাম?" আমার বেশ চমক্ লাগে।

"শিব্রাম চকরবরতির মতো।"

এবার আমি হক্‌চকিয়েই গেছি! বারে! আমি আবার কার মতো কথা বল্‌তে যাব? আমি কি—বল্‌তে কি—আমি নিজেই কি উক্ত অভদ্রলোক—সেই শিব্রাম চকর্‌বরতি নই?

"ওই রকম মিলিয়ে-মিলিয়ে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে ল্যাজামুড়ো এক করে' কথা বলা ভারী খারাপ! ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। বুঝলেন মশাই?"

"তুমি কি—ঐ কি নাম বল্লে—সেই ভদ্রলোককে কখনো দেখেচ?"

"না দেখিনি, দেখবার আমার বাসনাও নেই। ঐ ভদ্রলোক আমাকে যা বিপদে ফেলেছিলেন একবার।"

"য়্যাঁ, বলো কি? তোমাকে তিনি বিপদে ফেলেছিলেন?" আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওকে পর্য্যবেক্ষণ করি: "কই, আমার তো তা মনে পড়চে না!"

"উনি কি আর ফেলেছিলেন? ওঁর মতো কথা বল্‌তে গিয়ে আমি নিজেই ভীষণ বিপদে পড়েছিলাম!" ছেলেটি বল্ল: "হাড় কখানা আস্ত নিয়ে যে নিজের আস্তানায় ফির্‌তে পেরেছি এই ঢের!"

"ও, বুঝেচি! সেই তারা, সেই সব বিচ্ছিরি লোক, শিব্রাম চকর্‌বরতির লেখা যারা একদম্ পছন্দ করে না, তারাই বুঝি? তারা তোমার কথা শুনে, তোমাকেই শিব্রাম চকর্‌বরতি ভেবে, সবাই মিলে, ধরে বেঁধে বেশ এক চোট বেধড়ক্—"

"উঁহুহু!" ছেলেটি বাধা দেয়: "তারা কেন মার্‌বে? তারা কারা? তারা কোথ্‌থেকে এল? না, তারা নয়। সেই জন্যেই তো বারণ করচি, শিব্রাম চকর্‌বরতির মতো কথা কক্ষণো বল্‌বেন না। ওই ধরণের কথা বলার বদভ্যাস ছাড়ুন্,

জন্মের মত ছেড়ে দিন্—তা নাহলে আপনাকেও হয়তো কোন্‌দিন আমার মতো বিপদে পড়তে হবে।"

বন্ধুর উদ্দেশে বল্লাম- তাহলে চা থাক্! খোকার গল্পটাই শোনা যাক্! বলো তো ভাই, কাণ্ডটা। ওই বিষয়ে বল্‌তে কি, সব চেয়ে বেশী আমারই আগে সাবধান হওয়া দরকার।"

এবং আমার বন্ধু—যিনি এতক্ষণ চায়ের বিপক্ষে ছিলেন—চাউর করলেন ঃ

"না, চা আসুক্! এবং তুমিও এসো এই টেবিলে। ওহে তিন কাপ্ চা, আর—আর তিন ডজন বিস্কুট্! চা খাই আর না খাই, তোমাদের তো—কি বলে গিয়ে—চা পান করাতে দোষ নেই ?"

"খুব সাম্‌লে নিয়েছেন।" ছেলেটি আমাদের টেবিলে এসে বস্‌ল ঃ "বল্‌তে পার্‌তেন যে ঐটেই দস্তুর!—ঐ সঙ্গে বল্‌তে পারতেন আরো। কিন্তু খুব বাঁচিয়ে নিয়েছেন। শিব্রাম্ চকর্‌বরতি এখানে থাক্‌লে, ঐ দোষের জন্যে, দস্যুকেও নিয়াস্‌-তেন বিনা দোষেই। ঐটেই ওঁর মস্ত দোষ। টেনে হিঁচ্‌ড়ে কেমন করে' যে তিনি এনে ফ্যালেন।"

'কি করে' যে এত পারেন ভদ্রলোক, আমি আশ্চর্য্য হই।" আশ্চর্য্য হয়ে আমি বলি।

"যেমন করে' মুর্গিতে ডিম পাড়ে, তেম্‌নি আর কি!" বন্ধুবরের অনুযোগ ঃ "এমন কি শক্ত ?"

'শক্ত ? কিছু না।" ছেলেটি বলে ঃ 'আমরা সব্বাই

পারি। আমাদের ক্লাসের পেত্যেক ছেলে। আমাদের বাড়ীতে দাদারা, দিদিরা, এমন কি বৌদি পর্য্যন্ত। ওতো এনৃতার পারা যায়, ঐ উনি যা বল্লেন—একেবারে মুর্গির মতন। আস্ত ঘোড়ার ডিম। পেড়ে দিলেই হোলো—পার্‌তে কি! তবে লেখকের মধ্যে ঐ একজনই শুধু পারেন—কিন্তু পাঠকের মধ্যে হাজার হাজার। পাঠকের মধ্যে এক আমিই যা ঠেকে শিখেচি, আমি আর পার্‌ব না।” এই বলে’ ছেলেটি নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করে।

এরপর, আসল গল্পটা যতদূর সম্ভব ছেলেটির নিজের ভাষায় বলার চেষ্টা করা যাক্‌ঃ

‘গরমের ছুটিটা কোথায় কাটানো যায়’ ভাব্‌লুম, অনেক দিন তো যাইনি, কাকার ওখানেই যাই—” ছেলেটি স্বরু কর্‌ল বল্‌তেঃ ‘আসান্‌সোলে গিয়ে সোলে শান্‌ দিয়ে আসি। কলকাতার বাইরে ফাঁকাও হবে, আর আরাম করে’ থাকাও হবে। একেবারে আমের আশা যে ছিল না তাও না, তবে—না মশাই, আমার আমাশা ছিল না। তবে, কাকার বাগানে ঢুকে আম জাম যে বাগানো যাবে সে আশা খুবই ছিল।…”

ছেলেটি অম্লানবদনে অকাতরে বলে যাচ্ছিল, আর আমার চোখ ক্রমশই বড়ো থেকে আরো বড়ো হতে হতে, ছানাবড়া কি, লেডিকেনি পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে গেল। অবশেষে আমি আর থাক্‌তে পার্‌লেম না—

"থামো থামো! তুমি বল্‌চ কি? তুমি কি বল্‌চ, তুমি শিব্রাম চকর্‌বরতি নও? তুমি নিজেই নও? ঠিক বল্‌চ? ঠিক জানো? আমার গুরুতর সন্দেহ হচ্ছে, তুমিই শিব্রাম্ চকর্‌বরতি?"

"আমি? আমি না।" ছেলেটি ম্লান একটুখানি হাস্‌ল।

"বলো, নির্ভয়ে বলো, কোনো ভয় নেই। লোকটার ওপর রাগ আছে, আমাদেরও রাগ আছে, কিন্তু আমরা তোমাকে ধরে' ঠ্যাঙাব না।" আমার বন্ধুটি অভয় দিয়ে বলেন: "না, এমন সাম্‌নে পেয়ে বাগে পেলেও না।"

"কী যে বলেন! শিব্রাম চকর্‌বরতি-লোকটি কি এতই ছোট হবে?" এই বলে' ছেলেটি আত্মরক্ষার খাতিরেই কিনা বলা যায় না, অদূরবর্তী আয়নায় প্রতিফলিত নিজের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ল: চেয়ে দেখুন্ তো! আর শিব্রাম চকর্‌বরতির নাকি গোঁফ-দাড়ি একদম্ থাক্‌বে না?"

"সে একটা কথা বটে।" আমি ঘাড় নাড়ি: "শিব্রাম চকর্‌বরতি লোকটা এত ছোট না হওয়াই উচিত। এতদিনে তো সাবালক হবার কথা। তবে কিনা, ছোট লোকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তা ছাড়া, তা ছাড়া"—আমি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠি: "তুমি ঠিক ছদ্মবেশে আসো নি তো? মানে কিনা,—ভদ্র ভাষায় বল্‌তে হলে—আপনি ছদ্মবেশে আসেন নি তো শিব্রাম বাবু?"

ছেলেটি মুখ ভার করে' ভাবতে লাগল, বোধহয় তার ধরা-পড়ে-যাওয়া ছদ্মবেশের কথাই সে ভাব্তে লাগল। আমিও ভাব্তে থাকি, ঐ শিব্রাম-হতভাগাটাকে অননুকরণীয় বলেই আমার ধারণা ছিল। একটু অহঙ্কারও না ছিল তা নয়! অননু-করণীয়, মানে, অনুকরণের অযোগ্য। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ওর সম্বন্ধে আমার, অনেকের মতো আমারও একটা ভুল ধারণাই এতদিন থেকে গেছে! অত্যন্ত সহজেই যে-কেউ ওকে —মানে, ঐ-শিব্রামটাকে—টেক্কার পর টেক্কা মেরে বেটক্কর যেতে পারে। তবে আর কষ্ট করে' ওর লেখা পড়া কেন? ছোঃ! অন্ততঃ আমি তো আর পড়ছিনে; ওর আজে-বাজে যতো বই, আজ থেকে সব তালাক্ দিলাম, তালাবন্ধ থাক্লো বাক্সে!

'আপনি বল্ছেন আমিই সেই?" ছেলেটি আরো একটু ম্লান হাস্ল। 'ছদ্মবেশে এসেছি বলে আপনাদের মনে হচ্ছে? বেশ, তাহলে আমার নাক কান টেনে টেনে দেখুন! দেখ্তে পারেন টানাটানি করে'। মুখোস হলে তো খুলে আস্বে?"

ছেলেটি তার মুখ বাড়িয়ে দিল। আমার হাত সুড় সুড় করলেও আত্মসম্বরণ করে' ফেল্লাম: "আচ্ছা, পরে পরীক্ষা করে' দেখব'খন! এখন তোমার গল্প তো শেষ করো!"

আরম্ভ কর্ল ছেলেটি:

"গেছিতো কাকার বাড়ী। নিরাপদেই পৌঁছেচি। কাকা তখন বেদানা খাচ্ছিলেন, কোনো জ্বরজারি হয়নি, এমনিই

সুস্থ শরীরে বেদানা দিয়ে ব্রেক্ ফার্স্ট্ করছেন, দেখেই বুঝ্তে পারলাম্।

আমি যেতেই বল্লেন, 'এইযে, এইযে! মণ্টু যে! খবর কি? আছিস্ কেমন?'

'খবর ভালো। সামার্ ভেকেশন্ আমার কি না! ভাবলুম, আসানসোলে এসে সোলে একটু—'

কাকাবাবু বাধা দিয়ে বল্লেন: 'বেশ বেশ। এসেছিস্, বেশ করেছিস্। যখন পাবি তখনই আসবি। কাকা কাকীর বাড়ী সবাই আসে। আসে না কে?'

'ডাকাডাকি না করেই তো আসে।' ঐ সঙ্গে এইটুকুও যদি যোগ করতেন কাকাবাবু, ভারী খুসী হতাম। কিন্তু কাকাবাবু ওর বেশী আর এগুলেন না, অধিক বলা বাহুল্য মাত্র ভেবে চেপে গেলেন একেবারে। বোধহয় শিব্রাম্ চকর্বর্তির বই ওঁর তেমন পড়া-টড়া ছিলনা।

পায়ের ধূলো নিতে না নিতেই তিনি গলে পড়লেন: 'এই নে! বেদানা খা।'

বেদানার অনুরোধে বেশ দমে গেলাম। ও-জিনিষ অসুখ-বিসুখে খেতেই যা বিচ্ছিরি, তার ওপর সুস্থ শরীরে খেতে হলেই তো গেছি। বেদানাটা হাতে নিয়ে বল্লাম: 'কাকাবাবু! বেদানা দিলেন বটে, কিন্তু বলতে কি, একটু বেদনাও দিলেন!'

কাকা আমার কথাটায় কাণই দিলেন না।

'নে নে, খেয়ে ফ্যাল্! খেলে গায়ে জোর হয়। ভালো

শরীরে খেলেই আরো জোর বাড়ে। নে, ছাড়িয়ে খা। কাকা বেদানা দিলে খেতে হয়।'

মনে মনে আমি বলি, 'কাকস্য পরিবেদনা!' এবং প্রাণপণে বেদনা দূর করি, এক একটাকে পাক্‌ড়ে, গলা ধরে' দূর করে' দিই—একেবারে গালের ভেতরে। তারপরে আমার গলার তলায়।

'তুমি গলাধঃকরণ করো। বুঝতে পেরেচি।' আমি বলি।

'ঠিক বলেচেন! চমৎকার বলেচেন, কিন্তু'—ছেলেটি উস্‌কে উঠেই তক্ষুনি আবার নিব্‌ নিব্‌ হয়ে আসে, কেমন যেন মুষড়ে পড়ে। "তার পরে শুনুন্‌!—"

এমন সময়ে কাকীমা এসে পড়লেন। এসেই কাকার কবল থেকে আমাকে উদ্ধার কর্‌লেন।

'কী সকাল বেলায় ছেলেটাকে ধরে' ধরে' বেদানা খাওয়াচ্ছ? ওসব ওদের কখনো ভালো লাগে? রোচে কখনো? মণ্টু, আয় চপ্‌ খাওয়াব তোকে, ভালো এঁচোড়ের চপ্‌, আমার নিজের তৈরী, রান্নাঘরে আয়।'

পিতৃব্যস্নেহ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে হাঁপ্‌ ছেড়ে রান্নাঘরে গিয়ে উঠ্‌লাম। কাকীমা ছোট্ট একটু পিঁড়ি দিলেন বস্‌তে: 'বোস্‌।'

'না, এই ভুঁয়েই বসি।' আমি বল্লাম: 'পিঁড়ি দিয়ে কেন আর পীড়িত কর্‌ছেন কাকীমা?'

'য়্যাঁ, কি বল্লি?' কাকীমা কাণ খাড়া কর্‌লেন।

'পিঁড়ি তো নয়, পীড়নের যন্ত্র।' আমার পুনরুক্তি হোলো:
'যন্ত্রণাও বল্‌তে পারেন।' আরো ভালো করে বল্লাম আবার:
'না, কাকীমা, আমি প্রপীড়িত হতে চাইনে।'

কাকীমা যেন নিজের কাণকে বিশ্বাস কর্‌তে পারেন না।

'এসব আবার কেমন কথা?' কাকীমা হাঁ করে' রইলেন:
'যন্ত্র আবার যন্ত্রনা—কীসব যা তা বক্‌চিস্ আবোল তাবোল?'
কাকীমার দুই চোখ বিস্ময়ে চোখা হয়ে উঠলো।

'চপ্ দিন্, তাহলেই চুপ্ কর্‌ব।' বল্লাম আমি।

কাকীমা একটু ইতস্ততঃ করে' চপের প্লেট্‌টা এগিয়ে দিলেন।

কাম্‌ড়াতে গিয়ে দেখি দাঁত বসে না। চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র বাইরে এ আবার কি জিনিষরে বাবা?

'কাকীমা, এ কী বানিয়েছেন? এ কি চপ্? এর চাপ্ তো আমি সইতে পারছি না।' আমি জানাই: 'এঁচোড়গুলো আগে কিমা করে' নেন্‌নি কেন কাকীমা? এ যে চোরেরও অখাদ্য হয়েছে। এই চপের আঘাত না করে' আমাকে চপেটা-ঘাত কর্‌লেও পারতেন। আমি হাসিমুখে খেতাম।'

কাকীমার চোখ কপালে উঠে যায়, বহুক্ষণ তাঁর মুখে কথা সরে না। তারপর তাঁর সমস্ত মুখ কেমন-একটা আশঙ্কার আব্‌ছায়ায় ভরে' ওঠে। তিনি ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস্ করেন:

'ঢোক্‌বার আগে তুই এ-বাড়ীর ছাঁচ্‌তলাটায় দাঁড়িয়ে ছিলি না? তুইই তো? আমি ওপর থেকে দেখ্‌লুম যেন?'

'হ্যাঁ, ভাব্‌ছিলুম, আপনাদের নতুন দারোয়ান্‌ বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেবে কিনা! আমাকে ছ্যাখেনিতো আগে।' আমি কৈফিয়ৎ দিই: 'নাম লিখে পাঠাতে হবে ভেবে কাগজ পেন্‌সিল খুঁজছিলাম, কিন্তু দরকার হোলো না। সে একটু কাৎ হতেই আমি তার পেছন দিক দিয়ে সাঁৎ করে' গলে পড়েছি।'

'ছাঁচ্‌তলাতে তুইই দাঁড়িয়েছিলি!' কাকীমার সমস্ত মুখ ফ্যাকাসে হয়ে আসে: 'তাই তো বলি! কেন আমার এমন সর্ব্বনাশ হোলো।'

কাকীমা পা টিপে টিপে পেছোতে থাকেন: 'চুপ করে' বসে' থাকো। নোড়োনা যেন। আমি আস্‌চি এক্ষুনি।'

কাকীমার এই অদ্ভুত বিহেভিয়ার্‌ আমি যতই ভাব্‌চি ততই মনে মনে হেভিয়ার্‌ হচ্ছি। ওরকম ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার মানে? আমিও কি একটা এঁচোড়ের চপ্‌ না কি?

একটু পরে কে যেন দরজার ফাঁক্‌ দিয়ে উঁকি মারে। আবার কে একজন, একটু গলা বাড়িয়েই সরে' যায়। আমার কাক্‌তুত ভাইবোন সব, বুঝতে পারি। কাকার আর সব পরিবেদনা, কাকীমার অন্যান্য অনাসৃষ্টি। ইকোয়ালি অখাদ্য। এক একটি পাকা এঁচোড়ের চপ্‌। কেন বাপু, অমন উঁকি-ঝুঁকি মারামারি কেন? আমি যদি এমনই দ্রষ্টব্য, সাম্‌না সাম্‌নি এসে কি আমাকে দেখা যায় না?

ওদের সবার হাব্‌ভাব আমার ভারী খারাপ লাগে। কেমন

কেমন ঠ্যাকে যেন। আশপাশ থেকে চাপা গলা কাণে আসে, চারধার থেকে ফিস্ ফিস্ গুজ্ গুজ্ শুনি, আর আমার দু' হাত নিস্পিস্ করতে থাকে। ইচ্ছে করে, হাতের নাগাল না পাই, কসে এক ঘা—এই চপ্ ছুঁড়েই লাগাই না কেন এক একটাকে ?

ভাব্তে ভাব্তে, যেম্নি না দরজা তাক্ করে' একটা চপ্ নিক্ষেপ করেছি, ওই নেপথ্যের দিকেই—অম্নি হুটপাট্ বেধে গেছে। হুড়মুড়, দুড়্দুড়্, হৈ হৈ, দুদ্দাড়—রৈ রৈ কাণ্ড !

"বাবারে ! মারে ! ধর্লে রে ! গেছি রে ! কী ভূত রে বাবা ! খেয়ে ফেল্লে রে !" ভারী হৈ চৈ পড়ে গেল হঠাৎ।

আমি বিরক্ত হই। ভারী অসভ্য তো এরা ! খেয়ে ফেল্লাম কখন ? ও-চপ্ তো—না খেয়েই আমি ফেলেচি, এঁঠো তো নয়, তবে কেন ?

অবশেষে কাকীমা এলেন। সঙ্গে সঙ্গে এলো সনাতন। সনাতন এ-বাড়ীর পুরাতন চাকর। সনাতন কাল থেকে ওকে দেখচি।

দুজনেই সসঙ্কোচে ঢুকল।

সনাতন একেবারে আমার অদূরে এসে দাঁড়াল। কিরকম চোখ পাকিয়ে কট্মট্ করে' তাকিয়ে থাক্ল আমার দিকে। যেন চিন্তেই পার্ছে না আমায়।

পুরাণো চাল যেমন ভাতে বাড়ে, পুরাণো চাকর তেম্নি চালে বাড়বে, এ আর বিচিত্র কি ? তবু আমি একটু অবাক হলাম।

'কাকীমা এ কি ?' আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

কাকীমা কি রকম একটা সন্ত্রস্ত ভাবে দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন, বেশী আর এগোননি। তিনি কোনো জবাব দিলেন না। তাঁর পেছনে, চোখ বড়ো বড়ো করে' বাড়ীর যত ছেলে মেয়েরা, ঝি-চাকর যত।

সনাতন বিড়্‌বিড়্‌ করে' কী সব বকে, আর সর্ষে ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমায় লাগায়। আমার সারা গায়ে।

আমার ভারী বিচ্ছিরি লাগে। এবং লাগেও মন্দ না। 'সনাতন, এসব কি হচ্ছে ? তোমাদের সব মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ? কী বিড়্‌বিড়্‌ কর্‌চ ? তোমার ঐ কটাক্ষ আমার একেবারেই ভালো লাগ্‌চে না।'

সনাতন তবুও বিড়্‌ বিড়্‌ করে।

'কথং বিড়্‌বিড়য়সি—সনাতনং ?' আমি সংস্কৃত করে' বলি : 'সনাতন, তোমার এ বিড়ম্বনা কেন ?'

'আপনি কে ?' সনাতন এতক্ষণ পরে একটা কথা বলে।

'আমি—আমি তোমাদের মন্টু। আমাকে চিন্‌তে পার্‌চ না, সনাতন ?' আমি অবাক্ হয়ে যাই।

'মন্টু না হাতী !' সনাতন বলে : 'বলুন, আপনি কে ? আপনি কি আমাদের বেলগাছের বাবা ? দয়া করে' এসেচেন, পায়ের ধুলো দিতে, আজ্ঞে ?'

'ওসব রসিকতা রাখো। কারো বাবা-টাবা আমি নই, তা

বেলগাছেরই কি আর তালগাছেরই কি। ওসব গেছো ছেলেদের আমি ধার ধারিনে।'

'তবে কে তুমি? তুমি কি তাহলে আমাদের গোরস্থানের মাম্‌দো?' সনাতন একটু সভয়েই এবার বলে।

'বল্‌চি না, আমি মন্টু? ন্যাকামি হচ্ছে নাকি? কদ্দিন কতো চকোলেট্‌ খাইয়ে তোমায় মানুষ কর্‌লাম!' আমার রাগ হয়ে যায়।

'মন্টু না ঘন্টা। আমাকে আর শেখাতে হবে না। আমার কাছে চালাকি? ভূত চরিয়ে চরিয়ে আমার জীবন গেল। হাড় ভেঙে সুর্‌কি বানিয়ে দেব। বল্‌, কোন্‌ ভূত আমাদের মন্টুর ঘাড়ে চেপেচিস্‌? বল্‌ আগে?'

"বোধ হয় কোনো রামভূত!" আমি আর না বলে' পারি না। আধা-গল্পের মাঝখানেই বাধা দিয়ে বলি। স্বনামধন্য আমা'র নিজের প্রতিই কেমন যেন একটু কটাক্ষ হয়, কিন্তু না বলে' পারা যায় না।

"সনাতনও ঠিক ঐ কথাই বল্ল। বল্ল, 'গিন্নীমা, এ হচ্ছে কোনো রামভূত! সহজে এ ছাড়্‌বে না। রাম নামেও না। সর্‌ষে-পড়া নয়, এর অন্য ওষুধ আছে।'

এই বলে—"

ছেলেটি আরো বিস্তারিত করে:

"সনাতন কর্‌ল কি, জলভর্ত্তি বড়ো একটা পেতলের ঘড়া এনে হাজির কর্‌ল আমার সাম্‌নে। বল্ল, 'বুঝেচি তুই কে। ঐ অ্যাশ্‌শ্যাওড়ার শাঁকচুন্নী। টের পেয়েছি ঢের আগেই। তোল্‌, তোল্‌ এই ঘড়া দাঁতে করে'।'

"ভাবুন্‌ দিকি, কী ব্যাপার! ঘড়া দেখেই তো আমার চোখ ছানাবড়া। আমাকে ওরা যে কী ঠাউরেছে তাও আর আমার বুঝ্‌তে বাকী নেই। ওদের কাছে আমি এখন কিম্ভূতকিমাকার! আমার প্রতি ওদের কারু যে মায়া দয়া হবে না তাও বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। আমার ভূত না ছাড়িয়ে ওরা ছাড়বে না।

তবু একবার কাকীমাকে ডাকি—শেষ ডাকা ডেকে দেখি:

'কাকীমা, এসব তোমাদের কি হচ্ছে? আমাকে তোমরা পেয়েছ কি? এসব কি বাড়াবাড়ি? আমার একদম্‌ ভালো লাগ্‌ছে না।'

কাকীমা চোখের জল মুছে চুপ করে' থাকেন।

তখন সনাতনকে নিয়েই শেষ চেষ্টা কর্‌তে হয়। তাকেই বলি: 'বাপু, তোমার এই সনাতন-পদ্ধতি অতিশয় খারাপ। কী চাও বলো তো? চকোলেট্‌ না চারটে পয়সা? তাই দেব, ছেড়ে দাও আমায়।'

'শাঁকুচুন্নী ঠাক্‌রুণ, আর নাকে কান্না কেঁদনি! ভালো চান্‌ তো যা বলি, তাই করুন্‌ দিকি এখন।' এই বলে' সনাতন ঘড়াটাকে মন্ত্র পড়ায়।

"আমার মাথা ঘুরে যায়! জলভরা ঐ বড় ঘড়া—এক মণের কম হবে না। দু'হাতেই কোনোদিন তুল্‌তে পারিনি, আর তাই কিনা, মুষ্টিমেয় এই কটা দাঁতে আমায় তুল্‌তে হবে?

জাতও গেল, দাঁতও গেল, প্রাণও যায় যায়!

ধমক্ লাগায় সনাতন: 'ভালো চাস্ তো ন্যাকাপনা রাখ্! তোল্ দাঁতে করে'। নইলে দেখেছিস্—'

বল্‌তে না বল্‌তে সনাতন—"

ছেলেটি থেমে যায়। মুখ চোখ তার লাল হয়ে ওঠে। চক্‌চকে চোখ ছল্‌ছল্ করতে থাকে।

আমার বন্ধুটি উৎসাহ দেয়: 'বলো বলো—জমেছে বেশ।"

আমি কিছু বল্‌তে পারি না। মুখ কাঁচুমাচু করে' বসে থাকি। সব দায়, সমস্ত অপরাধ যেন আমার—আমারই কেবল। এই কেবলি আমার মনে হতে থাকে।

"বল্‌তে না বল্‌তে সনাতন ঘা কতক আমাকে লাগিয়ে দ্যায়! এই সনাতন, যাকে আমি কতো চকোলেট্ খাইয়েছি, ছোটবেলায় কতো না ওর পিঠে চেপেছি, কতই না ওকে পিটেছি, আর সেই কিনা……!"

ছেলেটির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। আমার এক চোখ দিয়ে জল গড়ায়। আমার বন্ধু রুমালে নাক মোছেন।

"জগতের এই নিয়ম।" বর্ষণমুখর চোখটা মুছে ফেলে আমি দার্শনিক হবার চেষ্টা করি। "তুমি কেঁদ না, কেঁদনা তোমরা,—সনাতন রীতিই এই! আজ তুমি যার পিঠে চাপছ, কাল সেই তোমার পৃষ্ঠপোষক। উপায় কি?" এই বলে আমার যথাসাধ্য ওদের সান্ত্বনা দিই।

ছেলেটি ম্লান একটুখানি হেসে আবার সুরু করে:

"বেশ বোঝা যায়, সনাতন আমার হাতে যত না মার খেয়েছে এর আগে, এখন বাগে পেয়ে সে সবের শোধ তুলে নিচ্ছে। এই সুযোগে এক ছুতো করে' বেশ এক্ চোট্ হাতের সুখ করে' নিচ্ছে। সুদে আসলে পুষিয়ে নিচ্ছে, বেশ বুঝ্তে পারি।

কি করি? কাঁহাতক্ মার খাবো? প্রাণের দায়ে ঘড়াকে মুখে তুল্তে যাই। কিন্তু পারব কেন? একটু আগে আমি যে চপেই দাঁত বসাতে পারিনি—কিন্তু সে তো এর চেয়ে ঢের নরম ছিল। আর এর চেয়ে হাল্কা তো বটেই!

সনাতন কিন্তু ঘড়ার চেয়েও কড়া। সে ধাঁ করে' তার ওপরেই—"

ছেলেটি আর বল্তে পারে না।

"বল্তে হবে না। আবার ঘা কতক্! বুঝ্তে পেরেচি।" আমার বন্ধুটি ভগ্নকণ্ঠে বলেন। এবং রুমালে নিজের চোখ মুছতে ভুল করে' তাঁর পাশের আরেক জনের মুখ মুছিয়ে ছান্।

আমার অপর চোখটি দিয়ে এবার জল গড়াতে থাকে।

"তখন আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়। এই ধাক্কায় মূর্চ্ছিত হয়ে গেলে কেমন হয়? তাহলে হয়তো এ-যাত্রা বেঁচে যেতেও পারি। রোজার হাত থেকে ডাক্তারের খর্পরে পড়্‌ব, হয়তো ইন্‌জেক্‌সন্‌ই লাগবে, তেঁতো ওষুধ গেলাবে, কিন্তু সেও ঢের ভালো এর চেয়ে।

বাস্‌, অম্‌নি আমি পতন ও মূর্চ্ছা—একেবারে নট্‌ নড়ন্‌ চড়ন্‌, নট্‌ কিচ্ছু!"

এই বলে' এতক্ষণ পরে ছেলেটি একটু হাস্‌ল, এবার আত্ম-প্রসাদের হাসি!

"মূর্চ্ছার মধ্যেই আমি শুন্‌তে থাকি, চোখ বুজেই শুন্‌তে পাই, সনাতন বল্‌ছেঃ 'গিন্নীমা, আমার মনে হয় ভূত নয়। ভূত হলে আলবৎ দাঁতে করে' তুল্‌ত। এর চেয়ে ভারী ভারী ঘড়া অক্লেশে তুলে ফ্যালে। আমার নিজের চোখেই ছ্যাখা! আমার মনে হয় মণ্টুবাবুর মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে! যা বড় বড় চুল, এই গরমে, তাই হবে। আপনি কাঁচিটা আমায় দিন্‌তো! চুলগুলো কদম ছাঁট্‌ করে' মাথায় ঠাণ্ডা গোবর লাগালে দুএক দিনেই খোকাবাবু শুধ্‌রে উঠ্‌বেন।'

এই কথা যেই না আমার কানে যাওয়া, আমি তো আর আমাতে নেই। হ্যাঁ, আমার এমন সাধের একচোখ-ঢাকা চুল—শিব্রাম চকরবরতির দেখাদেখি কত করে' বাড়িয়েছি—"

আমি বাধা দিয়ে বলি : "তবে যে তুমি বল্লে, শিব্রাম চকর্‌বরতিকে কখনো ছ্যাখোনি ?"

'ঠিক স্বচক্ষে দেখিনি। তবে আজকাল ওঁর যতো বইয়ে ওঁর চেহারার যে সব কর্টুন বেরয় তাই দেখেই আন্দাজ করে' রেখেছিলাম। আপনিও তো মশাই প্রায় তাঁর মত করেই চুল রেখেচেন দেখা যাচ্ছে !" আমার প্রতি কটাক্ষ করে' দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে ছেলেটি : 'কত কষ্ট করে' কত বকুনি সয়ে, কত সমাদরে বাড়ানো এই চুল, তাই যদি গেল, তাহলে আর আমার থাক্‌ল কি !"

"সনাতনের গিন্নীমা কাঁচি আন্‌তে গেছেন, আর আমি এদিকে চোখ টিপে টিপে চেয়ে দেখ্‌লাম, সনাতন খড়াটা সরাচ্ছে, সেই সুযোগে আমি না, একলাফে তিড়িং করে' না উঠে, চৌকাঠ্‌ পেরিয়ে, কাক্‌তুত রাক্কোসদের এক ধাক্কায় কক্ষচ্যুত না করে' সিঁড়ি ডিঙিয়ে একেবারে সেই সদরে—!

দারোয়ান্‌ হতভাগা, দ্বারে যার ওয়ান্‌ হয়ে সব সময়ে খাড়া থাক্‌বার কথা, সে-ব্যাটা তখন জিরো হয়ে পড়েছিল। ইংরিজি ওয়ান্‌-এর বদলে, বাংলা ১ বনে' গিয়ে পা গুটিয়ে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে জিরোচ্ছিল, আমি না সেই ফাঁকে—

'ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌ !' সোর্‌গোল উঠ্‌ল চারদিকে।

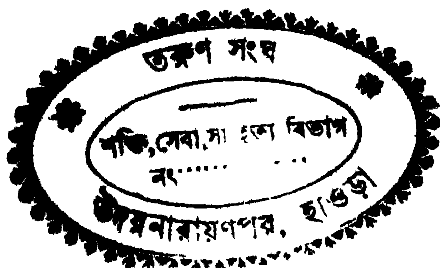
আর ধর্‌ ! এই ধুরন্ধর ততক্ষণে—" ছেলেটি থেমে গেল। গল্পটাকে সুচারুরূপে শেষ করার জন্য, কপাল কুঁচ্‌কে, যুৎসই একটা কথা খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল মনে হয়।

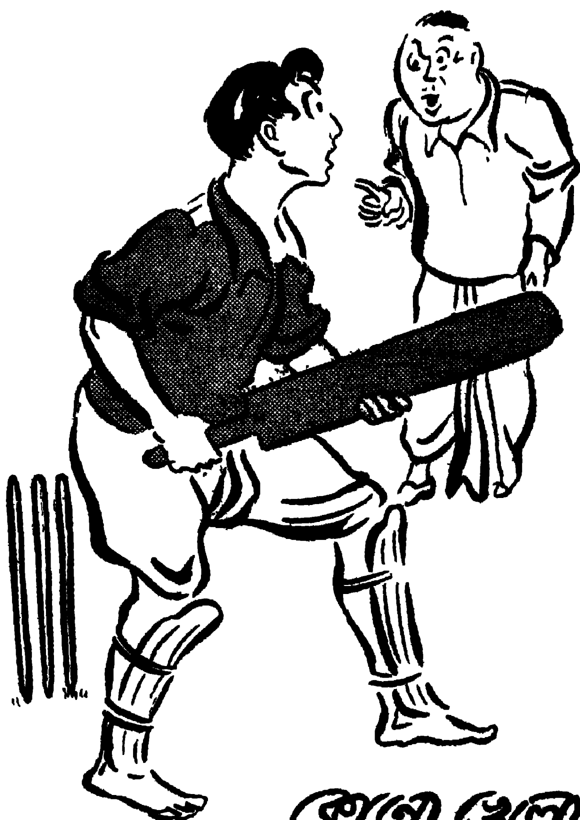
"পালিয়ে এসেচ। বুঝ্‌তে পেরেচি, আর বল্‌তে হবে না।" আমার বন্ধুটিই পালা শেষ করেন। "পালানো হচ্ছে একটা লম্বা ড্যাশ্‌—ওর কোথাও ফুল্‌ষ্টপ্‌ নেই।"

"তোমার নামটি কি?" আমি জিগ্যেস্‌ করি! "মণ্টু তো বলেছ। কিন্তু ভালো নামটি কি তোমার?"

"ধ্রুবেশ।"

"বাঃ, বেশ!"—বল্‌তে গিয়ে আমার বলা হয় না। গলায় আট্‌কায়।





কোনো খেলাই
সহজ নয়!

শরীর সুস্থ রাখতে ব্যায়ামের দরকার। আর ব্যায়ামটা যদি খেলাধূলার ছলে নিজের অগোচরে হয়ে যায় সেটা ভালো আরো। কিন্তু সব খেলাধূলা আবার আমার পোষায় না। লুডো, দাবাবোড়ে, স্নেক্ এ্যাণ্ড ল্যাডার এ সব খেলাকে সহজেই আমি পোষ মানাতে পারি বটে, কিন্তু ওগুলোতে তেমন নাকি ব্যায়াম নেই। এধারে ফুট্‌বল্, ক্রিকেট্—এসব খেলার সঙ্গে গায়ের জোরে আমি পেরে উঠিনে—— 'রাগবি ?' ওবাবা ! রাগবি খেলায় লাগবার মতো রাগবার অতো ক্ষমতা নেই আমার। রেগেমেগে কিছু করা আমার অসাধ্য। রাগ-রাগিনী-রাগ্‌বি—এসব আমার সয় না।

অবশেষে ব্যাড্‌মিণ্টনকেই অনেক বেছে ধরা গেল। এক-কালে এই খেলাটারই যা একটু আমার অভ্যেস ছিল। এই খেলাটাই ধরা যাক্ ? কিন্তু আমার সঙ্গে এ বিষয়ে উদ্যোগী হবে এমন আরেকজনকেও ধরা চাই তো ? মুস্কিল হয়েছে, ধর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে এমন একটা লোকও এ পাড়ায় নেই। অনেক করে' ধরাধরি করে' অশোককে পাওয়া গেল অবশেষে।

অশোক কিন্তু গাঁইগুঁই করে, কিছুতেই খেলতে রাজি হয় না। বলে, "আমি ভাই ও খেলার কিছুই জানিনে।"

"শিখে ফেলতে পারবে। শিখতে কতক্ষণ ?" আমি ওকে উৎসাহ দিই; সত্যি বলতে আমার নিজেরও তো সবেমাত্র সুরু। ক'মাসই বা খেলছি। অবিশ্যি আগের একটু অভ্যাস ছিল কিন্তু সেও কতকাল আগে ! দু'একদিন অভ্যেস

করলে তুমিও আমার মতন ভাল—কিম্বা আমার মতই খারাপ খেলতে পারবে। আশ্চর্য্য নয়।"

অশোক তবুও ঘাড় নাড়ে। খেলাধূলায় এতদূর নারাজ হতে পারে এমন ছেলে এর আগে আমার নজরে পড়েনি।

"খেলাধূলা আমি চিরদিনের মত ছেড়ে দিয়েছি ভাই।" বল্ল অশোক ঃ 'খেল্‌লে আমার ভারী মন খারাপ হয়। তবে আমি যে হেরে যাই কি খারাপ খেলি তার জন্যে না। খারাপও খেলি না, আর হারিও না বড় একটা, তবে বড্ড ভুল খেলে থাকি। এই জন্যই মনকষ্ট পাই। অনর্থক মনকে আর কষ্ট দিতে ভাল লাগে না।" এই বলে' সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল।

"ভুল খ্যালো, তার মানে ?" আমি জিজ্ঞেস না করে পারিনা।

"ছোটবেলা থেকেই ভুল খেলি—যে খেলাই খেলতে যাই। তার জন্য ওস্তাদদের কাছ থেকে কী কম বকুনিটাই খেয়েছি। প্রথম যখন ক্রিকেট খেল্‌তে ধরলাম, ইস্কুলে পড়ি তখন। আমাদের গেম্ মাষ্টার বল্লেন, অশোক, তুমি ব্যাট ঠিক ধরতে পারছ না। আমি তো ভারী ধাঁধাঁয় পড়ে গেলাম। ধরেছি তো, আবার কি করে' ব্যাট্‌ ধরতে হয় ? আমার নিজের ধারণামত ব্যাট্‌কে আমি দস্তুরমতই ধরেছিলাম। কেবল ধরা কেন, পাকড়ে ছিলাম বল্লেই ঠিক হয়। কিন্তু ওই ধরণের ব্যাট্‌-ধারণ গেম মাষ্টারের মনঃপুত নয়। তিনি বল্লেন,

ধরতে পেরেছি। কেন তোমার এই ধারা গলদ হচ্ছে ধরা গেছে। তুমি কি কখনো ডাণ্ডাগুলি খেল্‌তে? খেলতে নাকি? 'এক আধটু'—আমি স্বীকার করলাম, 'কখন সখনো—এই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গেই।' "বোঝা গেল এইবার।" বল্লেন গেম মাষ্টার, "সেই ডাণ্ডাগুলির ডাণ্ডার মতোই তুমি ব্যাট্‌ পাক্‌ড়েছ বটে। ও ভাবে ধরা নিয়ম নয়। ক্রিকেট্‌ খেলার একটা ষ্টাইল্‌ আছে। সে ষ্টাইল্‌ই হোলো আলাদা।" এই বল্লেন গেম্‌ মাষ্টার।" বল্‌তে বল্‌তে অশোক থামল।

"গেম মাষ্টার ঠিক কথাই বলেছিলেন।" আমি বল্লাম।

"সে কথার আমি প্রতিবাদ করি না। গেম্‌ মাষ্টার আরো বল্লেন যে ক্রিকেটে আমি কোনোদিন শাইন্‌ করতে পারব না—যদি না ঐ ভাবে ব্যাট্‌ ধরার বদভ্যাস আমি ছাড়তে পারি। অবশ্যি, তাঁর ঐ বলার পরেই পর পর আমি চারটে বাউণ্ডারি করে' দিলাম তাঁর দেওয়া বলের বিরুদ্ধেই, ঐ ভাবে ব্যাট ধরেই যদিও। কিন্তু তবু তিনি খুসি হলেন না বা তাঁর মত্‌ বদলানোর বিশেষ কোনা কারণ খুঁজে পেলেন না।"

অশোক মুখভার করে তার শোকাবহ জীবনীকাহিনী ব্যক্ত করে চল্‌ল।

ঐ ক্রিকেট-কাণ্ডের কয়েক মাস পরে (অশোক বল্ল অমায়) সে একবার টেনিস খেলা ধরেছিল। এমন কি, একটা ইণ্টার স্কুল টেনিস প্রতিযোগিতায় নেমেছিল পর্য্যন্ত। এই প্রতি-যোগিতায় যে ছেলেটি তার প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়ায় তার বাবা

বিখ্যাত করাসী প্লেয়ার কোশের সঙ্গে একহাত খেলেছিলেন— কোশে যখন কলকাতায় এসেছিল সেই সময়ে। কাজেই, তাকে যে কোনো ছেলে হারাতে পারবে এ আশা কেউ করেনি, সে নিজেও না, আশোকও নয়। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, কি করে' বলা যায় না, অশোক তাকে সব কটা সেটেই হারিয়ে দিল।

সেই ছেলেটি, খেলা শেষ হয়ে গেলে, অশোককে ডেকে বলেছিল, "খোকা, তোমার বয়েসের তুলনায় তুমি ভালোই খ্যালো একথা বলতে আমার বাধা নেই, কিন্তু আমার ভয় হয়, কোনোদিনই তুমি প্রথম শ্রেণীর টেনিস প্লেয়ার হতে পারবে না। কোশের মত হওয়া দূরে থাক, আমার বাবার মতও নয়। তুমি যে ভাবে র‍্যাকেট ধরেছিলে অমন করে' র‍্যাকেট ধরতে এর আগে আর কাউকে আমি দেখিনি। তুমি কি কখনো ক্রিকেট খেলতে?"

"কিছুদিন আগে খেলেছিলাম।" বলতে হোলো অশোককে : 'এক আধবার। সে নামমাত্র। কবে ছেড়ে দিয়েছি!"

শোনবামাত্রই ছেলেটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে বলল, "ধরেচি ঠিক। কেন যে তুমি র‍্যাকেটের প্রতি ক্রিকেট ব্যাটের মত ব্যবহার করছিলে এখন তা টের পাওয়া গেল।" এই বলে' সেই ছেলেটি একটু মুচকি হেসে, অশোকের সমস্ত জয়গৌরব ম্লান করে' দিয়ে চলে গেল।

এর ফলে অশোক তার হৃদয়ের দুর্ব্বল স্থানে দারুণ আঘাৎ

পেয়েছিল, বলাই বাহুল্য। র‍্যাকেটের প্রতি ব্যাটের মত ব্যবহার করা—দুর্ব্ব্যবহার করা ছাড়া আর কি? ভগ্নহৃদয়ে সেই দণ্ডেই সে টেনিস খেলা ছেড়ে দিল চিরদিনের মতন।

এবং একটু আশান্বিত চিত্তে ফের সে ফিরে গেল ক্রিকেটে তারপর। আর যাই হোক, র‍্যাকেটের দৌলতে, ব্যাট ধরবার কায়দাটা তো সে শিখতে পেরেছে—সেটাও বড় কম লাভ নয়। এবং ক্রিকেট খেলাতেও কি কোশের তুল্য বিখ্যাত কেউ নেই—যাঁরা কষে ব্যাট হাঁকড়ে পুনঃ পুনঃ সেঞ্চুরি করে' অমর হয়েছেন? তাঁদের একজনের সমকক্ষ হতে পারলেও তো হয়! তাইকি কিছু কম না কি? এবং তা কি সে হতে পারবে না কোনো দিন? টেনিসে অনুযোগ লাভ করে' ফিরে এসে সে ক্রিকেটে যোগদান করল।

এবং এবারেও একাদিক্রমে কয়েকটা বাউণ্ডারি আর অসংখ্য রান্ তুলে ফেলবার পরে গেম্ মাষ্টার এগিয়ে এলেন। এসে বল্লেন, "অনর্থক তুমি খেলতে নেমেছ। ক্রিকেট তোমার দ্বারা হবার নয়। তোমার হাত দেখছি বিগড়েছে আরো। ঠিক টেনিস র‍্যাকেটের মতই তুমি ব্যাট ধরছ এখন। এবং এটা আগের চেয়েও খারাপ।"

অশোক দমে গেল খুব। যতই না সে জিতুক, লোকে ঘাড় নাড়তে থাকে। বলে, ও কিছু না, কিছু হচ্ছে না। জিতলে কি হবে, ওর খেলায় কোনো ষ্টাইল নেই। আর ষ্টাইলই যদি না থাকল তাহলে আর খেলার থাকল কি?

এতদূর পর্য্যন্ত উল্লেখের পর অশোক আমার মুখের দিকে তাকালো: "এ বিষয়ে তোমার কি মত? ঐ লোকদের কথাই কি ঠিক না?"

আমি উক্ত লোকদের উক্তিতে সায় দিতে বাধ্য হলাম। বল্লাম, 'ঠিকই বলেছে ওরা। খেলায় হারজিত বড় নয়। এমন কি, খেলাটাও কিছু না। খেলার চেয়ে খেলার কায়দাটাই হোলো আসল। সেইটাই বড় কথা। কায়দা করে' খেলে মোহন বাগান কতোবার তো হেরে গেছে, ছাখো নিকি? কিন্তু তাতে কি তার মাহাত্ম্য একটুও ক্ষুন্ন হয়েছে?··· যাক্‌গে, তুমি কি তার পরে ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দিলে একেবারে?"

'জন্মের মত।" বল্ল অশোক: 'ন্যাড়া আবার কবার বেলতলায় যায়?"

এর পরের বৃত্তান্তটাও শুনলাম অশোকের। সব শেষে, খেলাধূলা সমস্ত ছেড়ে সে একটা কুস্তির আখড়ায় ভর্ত্তি হয়েছিল। দেহচর্চ্চার জন্য একটা কিছু করা চাই তো।

কিন্তু যেমনি সে মুগুর ভাঁজতে সুরু করেছে আখড়ার ওস্তাদ হাঁ হাঁ করে' ছুটে এলেন—"ওকি? ওকি হচ্ছে? করছ কি? মুগুরের অমন করে অপমান করছ কেন?"

অশোক ভাবল, ঘোরাবার মুখে মুগুরটা পায়ে ঠেকেছিল বলেই বোধহয় ঘাট হয়েছে। অম্‌নি সে ভয়ে ভয়ে মুগুরকে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করল। মুগুরের পায়ে মাথা ঠুকতে

বাধ্য হোলো, কি করবে ? ওস্তাদের চেহারা মুগুরের চেয়েও গুরুতর ছিল কি না!

কিন্তু তাতেও ওস্তাদজী শান্ত হবার নন্। তিনি কেবল আপ্‌সোস্ করেন—"এ কি রকম মুগুর ভাঁজা তোমার ? এরকম তো কেউ মুগুর ভাঁজে না। তুমি কি কখনো ক্রিকেট খেল্‌তে নাকি ? ব্যাটের মতো মুগুরটাকে হাঁক্‌ড়াচ্ছো বলে' যেন বোধ হচ্ছে।"

এই কথা শুনে মুগুর ফেলে সেই যে অশোক সেখান থেকে দৌড় মেরেছে আব তাকে আখড়ার ত্রিসীমানাতেও কেউ ছাখেনি। এই তার খেলাধূলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,—এসব শুনে' এর পরেও কি তাকে আমি ব্যাডমিন্‌টন্ খেল্‌তে বলি ? সে আমায় প্রশ্ন করে। আমি হয়ত বল্‌তে পারি কিন্তু তার মোটেই আর সাহস হয় না। সে নিজেই নিজের উত্তর দিয়ে দেয়।

"খ্যালো না, ক্ষতি কি ?" আমি প্রত্যুত্তরে বলি : "যতো খুসি তুমি ভুল খেলতে পারো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এবং আমার কোনো আপত্তি নেই। তুমি যদি খেলার দোষে হেরে যাও তাহলে আমি খুসিই হবো। হারাতে পারলে আমার ভারী আনন্দ হয়।"

আর কিছু না, কেবল আমাকে আনন্দদানের জন্মেই নিস্বার্থপর হয়ে অশোক খেলতে নামল। কিন্তু আনন্দ দেওয়া দূরে থাক, একটার পর একটা, ও নিজেই 'গেম্ আপ্' করে'

চল্ল। অল্প কিছুদিন খেলাটা ধরলেও, এর মধ্যেই বেশ আমি রপ্ত হয়েছিলাম বলে', ধারণা হয়েছিল, ও কিন্তু প্রথম নেমেই আমার সে ধারণা টলিয়ে দিতে থাকে।

পরের পর ওর কাছে পরাজয় লাভ করে' আত্মসম্বরণ করা কঠিন হয়ে উঠল আমার পক্ষে। আমি না বলে' আর পারলাম না:

"অশোক, তুমি খেলছ খ্যালো, কিন্তু এ কী রকম খেলা তোমার? ব্যাড্‌মিন্‌টন্‌ কি ওই রকম ক'রে খ্যালে? এ যদি ব্যাড্‌মিন্‌টন্‌ হয় তাহলে ওয়ার্স্‌ মিন্‌টন্‌ কাকে বলে আমি জানিনে। এমন কি, তোমার খেলাকে ওয়ার্স্‌ট্‌ মিন্‌টন্‌ বললেও অত্যুক্তি হয় না।"

"কেন, আমার কী দোষ হোলো ভাই? আমি জিতছি তো।"—ও কাঁচুমাচু হয়ে বল্‌ল।

"ওটাই তো তোমার মহদ্দোষ। বেতালা খেলেও জিতে যাচ্ছ, তাতেই তো রাগ হচ্ছে আরো। র‍্যাকেট্‌টাকে, মনে হচ্ছে, যেন ঠিক মুগুরের মতই তুমি ভাঁজতে লেগেছো।"—বলি আমি।

যেই না বলা, আর মুগুরের কথা যেই না কানে যাওয়া ওর, র‍্যাকেট ফেলে কানে আঙুল দিয়ে সেই যে অশোক আমার কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে আর তার কোনো পাত্তা পাই নি।



পাগলামির মহৌষধ!

বিখ্যাত সাহিত্যিক অমুক চন্দ্র অমুক অত নম্বর ঠিকানা হইতে জানাইয়াছেন যে আমাদের 'মোক্ষম্ রসায়নের' এক শিশি মাত্র সেবন করিয়াই তাঁহার পাগ্‌লামি সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গিয়াছে—এই ধরণের একটা বিজ্ঞাপন, ট্রামে কিম্বা বাসে, খবরের কাগজে কিম্বা পি এম্ বাক্‌চীর পাঁজিতে, সিনেমা স্লাইডে কিম্বা ইষ্টিশনের প্ল্যাটফর্মে, কোথাও না কোথাও হয়ত তোমরা দেখে থাকবে।

বলাবাহুল্য, উক্ত অমুক চন্দ্র অমুক আর কেউ না, স্বয়ং আমি। তবে বিখ্যাত সাহিত্যিক আমি কোনদিনই ছিলুম না। অন্ততঃ ওই বিজ্ঞাপনের আগে তো নয়ই। যদ্দূর জানা যায়, যত জনা আমার বই পড়েছে তার চেয়ে ঢের বেশী, হাজার গুণ লাখগুণ বেশী লোক, ট্রাম বাসে চড়ে, খবর কাগজ পড়ে, পাঁজি ওল্‌টায়, সিনেমা দ্যাখে আর হাওড়া শেয়ালদায় দৌড়াদৌড়ি করে' মরে। তারা সবাই ওই বিজ্ঞাপন পড়েছিল। আর বল্‌তে কি, তার ফলেই এই যা একটু আমি বিখ্যাত হয়েছি। আমার প্রশংসাপত্রে ওষুধটার কিছু সুবিধা হয়েছিল কি না জানি নে তবে ঐ বিজ্ঞাপনের দৌলতে আমার বইয়ের এক আধটু কাটৃতি হয়ত হয়ে থাকৃবে।

কিন্তু পাগ্‌লামি আমার ছিল কি না, কিম্বা থাক্‌লেও সেরেছিল কি না, এবং সারলেও সম্পূর্ণরূপেই সেরে গেছে কিনা সে কথা আমি বল্‌তে পারব না। যদি বলো যে পরের

টাকার প্রত্যাশা করাটাই পাগ্‌লামি তাহলে বল্‌ব—মাসী কি কারো পর? মাসী যে মার চেয়েও আপনার গো!

এইত যুদ্ধের কিছুদিন আগের কথা বল্‌ছি। সেই সময়ে আমি এক পাব্‌লিসিটি আপিসের জন্য বাড়ী বসে বিজ্ঞাপনের কপি লিখতাম। (জীবনে কতো কাজই যে করা গেছে!) ঘি-তেল, সন্দেশ, ওষুধ, বিস্কুট-বার্লি লোহা-লক্কর সব কিছুর বিজ্ঞাপনই আমাকে লিখতে হোতো। ওটা ছিল আমার গল্প লেখার উপ্‌রি পাওনা। সারাদিন যে ব্যক্তি কামার শালায় হাতুড়ি পেটে, সেও যেমন সন্ধ্যাবেলায় তাস পিট্‌তে বসে—আহা, তারও তো কোনো সময়ে ব্যায়াম করা দরকার! —আমারও তেম্‌নি, এই কাজটা, গল্পলেখার ওপরে হলেও, এতে দস্তুরমত এক্‌সার্‌সাইজ্‌ হোতো। তাসখেলার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

প্রথম বিজ্ঞাপন লেখার কাজ আমার হাতে এল ঐ মোক্ষম্‌ রসায়নের মারফতে। অতএব ওকেই প্রথম এক হাত নিলুম। প্রচারের সবচেয়ে বড়ো আর্ট আত্মপ্রচার, কাজেই ওষুধের সঙ্গে নিজেকেও জাহির করতে ছাড়লুম না। রথদেখার সাথে কলাবেচার এই সুযোগ নিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ যে নিজেই ডেকে আন্‌ছি তা যদি তখন জান্‌তাম! উক্ত মহৌষধ না খেয়েই ওর সাহায্যে যে আমারও পাগ্‌লামি সারবে তা কে ভাব্‌তে পেরেছিল!

তারপর এইতো সেদিন, শশাঙ্কর সঙ্গে দেখা। আমার

বন্ধু শশাঙ্ক। এক রেস্তর্াঁয় বসে চা খাচ্ছি, শশাঙ্ক এসে উদয় হোলো। তাকে দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লাম, 'ভাই, জীবনে ছোটখাট ব্যাপারে যা বিপর্যয় আনে বড় বড় কাণ্ডও তার কাছে লাগে না। এমন কি এত বড় যুদ্ধও তার কাছে কিছু নয়!"

"যাও, তোমাকে চা খাওয়াতে হবে না।" শশাঙ্ক রাগ করে' বল্ল: 'সামান্য এক কাপ্ চা খাওয়াবে তার জন্য এত কথা!"

শশাঙ্ককে দেখে সশঙ্কিত হইনি বলাই বাহুল্য। সে কথা তাকে বল্লাম। বল্লাম: "তোমার কথা বল্‌ছি না। আমার এক মাসির কথাই বল্‌ছি। তিনকুলে তাঁর কেউ নেই। থাক্‌বার মধ্যে এক বোন্‌ঝি—আমাদের বিনি—আর তস্য ভ্রাতা শ্রীমান্—"

"বুঝেছি।" বল্ল: "তস্য ভ্রাতাকে বুঝতে পেরেচি। আর কষ্ট করে বল্‌তে হবে না"

"তাঁর অগাধ টাকা। তিনকূলে থাকবার মধ্যে এই। মাসির বয়েস শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে প্রায় সত্তর, কিন্তু গত পনের বছর ধরে তিনি শয্যাগত। মৃত্যুমুখে উপনীত হয়ে রয়েছেন বলা চলে। কখন্ যান্ কিছু ঠিক নেই। থাকেনও খুব দূরে নয়, কাছাকাছিই, এই তারকেশ্বরে। নিজেও যেমন সেকেলে, তেম্‌নি এক সেকেলে জরাজীর্ণ অট্টালিকায় বাস করেন। একালের যা কিছু তাঁর দুচোখের বিষ। আজকালকার

নভেলে, বিশেষ করে আমার বইয়ে যেসব মেয়েদের দেখা যায়, তাদের ওপর তিনি হাড়ে-চটা। সেই জন্যে আমার বই ভুলেও কখনো তাঁকে উপহার পাঠাইনে। সে যুগের ঠাকুমাদের দেখেছ? আমার মাসিমা তাঁদেরই এক রাজ সংস্করণ কিম্বা রাণী সংস্করণ যা বলো! তাঁর ডাক্তার—গঙ্গারাম না কী যেন নাম তাঁর—তিনি আবার আমার মাসির চেয়েও বয়সে ভারী। দেখলে মনে হয় ধড়াচূড়া পড়ে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস থেকে সদ্য সদ্য বেরিয়ে এসেছেন—পাতা ছিঁড়ে একেবারে।"

"ইয়া ইয়া দাড়ি গোঁফ?" শশাঙ্ক বাধা দিয়ে জানতে চায়।

"ইয়া দাড়ি, ইয়া গোফ! আর তাঁর চিকিৎসাও তেম্‌নি সেকেলে ধরণের। তাঁর চিকিৎসাগুণে মাসিমা গত পনের বছরের মধ্যে বিছানা থেকে একবারও নড়েছেন কিনা সন্দেহ। কেউ তাঁকে একদণ্ডের জন্যও রুগ্নকক্ষের বাইরে আসতে দ্যাখেনি।"

"তা যাই হোক্, তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে তো ঠিক! চিকিৎসার বাহাদুরি আছে বই কি!"

কাজেই আমিই গিয়ে মাঝে মাঝে মাসিমাকে দেখা দিয়ে আসি। মাসিক আর হয়ে ওঠে না, এই ন'মাস ছ'মাস অন্তর অন্তর। অন্তরের টান অবহেলা করা যায় না, রুগ্ন মাসির দেখা শোনা করতেই হয়।—"

"মাসির অনেক টাকাকড়ি আছে বল্লে না?" শশাঙ্ক জিজ্ঞেস্ করে: "মাসি মারা গেলে তোমরাই তো পাবে?"

"আহা, সেইজন্যেই যাই নাকি! তাই তুমি বলতে চাও?" আহত কণ্ঠে আমি বলি: "অবশ্যি, মেসোমশাই যেসব শেয়ার্ কিনে রেখে গেছেন, এই যুদ্ধের দরুণ তাদের অনেকগুলোর দর এখন ভয়ঙ্কর চড়েছে সন্দেহ নেই, তাছাড়া থোক্ দশ বিশ হাজার নগদ যে নেই তাও নয়, কিন্তু তাই বলে' আমাকে অতটা স্বার্থপর তুমি ভেব না। অমন টাকাকড়ি না থাক্‌লেও মাসিকে দেখতে আমি তবুও যেতাম। অম্‌নিই. যেতাম। তবে কি না, সময়াভাবে গত সাত আট মাসের মধ্যে আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি।"

'তোমার সময়াভাব?" শশাঙ্ক অবাক্ হয়ে যায়।

"ভারী আমার সময় দেখেচ! বলে, ভাব করবারই সময় পাচ্ছিনে! কিন্তু সে কথা যাক্। হয়েচে কি, কাল হঠাৎ সেই মাসির এক চিঠি এসে হাজির। দিনকতর জন্য তিনি কলকাতায় আসচেন। আমাদের বাসাতেই উঠ্‌বেন লিখেচেন।"

"তিনি শয্যাগত না, বল্লে না তুমি?" শশাঙ্ক প্রশ্ন করে।

"শয্যাগতই বই কি!" আমি জবাব দিই: "আর তাতেই তো বিনি আর আমি অবাক্ হয়ে গেছি। তিনি খুলে তো কিছু লেখেন নি। আস্‌চেন, এই মাত্র। অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীতে আস্‌বেন কি ষ্ট্রেচারে করে' আস্‌বেন কে জানে!"

"ভারী মুস্কিলের কথা তো।" শশাঙ্কর মন্তব্য হয়।

"মুস্কিলের কথাই বটে। সত্যি বল্‌তে, আমরা যে-কোনো

মুহূর্তে তাঁর শোকসংবাদ শোনার জন্যেই এতদিন প্রস্তুত হয়ে ছিলাম,—তিনি যে এভাবে এসে আমাদের দেখা দেবেন তার জন্য কখনই—"

"তৈরী ছিলে না।" শশাঙ্ক আমাকে বল্‌তে বাধা দেয় : "বুঝতে পেরেচি। খুবই দুঃখের কথা, তোমার এই হতাশায় সান্ত্বনা দানের আমার ভাষা নেই। কিন্তু কি করবে বলো ভাই! দুনিয়াটাই এই রকম। রবীন্দ্রনাথেব কবিতায় পড়েচ তো, যাহা চাই তাহা ভুল করে' চাই, যাহা পাই তাহা চাই না! এও সেই রকম। বল্‌ব কি তোমায়, আমারও এক প্রমাতামহ, এত বুড়ো যে তাঁকে বৃদ্ধ প্রমাতামহও বলা যায়, পাকা আমটি যেন, বিস্তর বিষয় আশয় আগ্‌লে দিব্যি টি'কে রয়েছেন। তাঁর সম্পত্তি পাবার আশায় আশায় আমার পিতামহ মারা গেলেন, পিতাও গেলেন—এখন আমি তাঁর একমাত্র প্র-নাতি কায়ক্লেশে কোনো রকমে বেঁচে আছি। খুব সম্ভব, আমাকেও না মেবে তিনি মরবেন না।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ল শশাঙ্ক।

"না আমার সে কথা নয়।" আমারে চমকাতে হয় : "মাসি দেহরক্ষা করুন্ তা আমি চাই না। বরং আরো দীর্ঘজীবিনী হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে আরো সুদীর্ঘ কাল তিনি বেঁচে থাকুন। অন্ততঃ আরো ন মাস কি ছ মাস কি মাস আড়াই তিনি বাঁচুন, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁর এই কলকাতায় আসা—এতেই আমি এত ঘাব্‌ড়ে গেছি! তিনি রাণী ভবানীর আমলের মানুষ—একেলের আমাদের চালচলন

সইতে পরেবেন কিনা কে জানে! বিনির জন্যেই আমার ভাবনা আরো, গঙ্গারাম ডাক্তারের কাছে একবার সগর্ব্বে ওঁকে বল্‌তে শুনেছিলাম, আমার বোন্‌ঝি মোটেই একেলে মেয়ের মতো না। সে যুগের সেই দময়ন্তী না কার মতন যেন! এখন, বিনি যা আপ্‌ টুডেট্‌ মেয়ে, তাকে কি দমন করা, আই মীন্‌, দময়ন্তী করা যাবে?"

"বুঝিয়ে বলো! বুঝিয়ে বলো ভালো করে"। বলো যে, মাসি চটে গেলে তোমাদের উড়িয়ে দিয়ে পোষ্যপুত্র নিয়ে বস্‌তে পারেন, চাইকি, যাদবপুরের হাসপাতালের টাকাটা দিয়ে ফেলা শক্ত নয়—অবিশ্যি, তা দিয়ে গেলেও, যক্ষ্মা বানিয়ে সেখানে গিয়ে সম্পত্তির উপসত্ত্ব তোমার উপভোগ করতে পারো, কিন্তু অতো ঘুরপাকে যাবার দরকার কি? তার চেয়ে সব কথা বিনিকে—সোজা করে' বোঝাও। বিনি তো আমাদের অবুঝ নয়।" শশাঙ্ক বলে।

"তাছাড়া, বাড়ী ঘরের কথাও ভাবতে হয়। কোথাও যদি সেকেলে কিছুর একটু ছিটে ফোঁটাও থাকে! সব একেলে আস্‌বাব, আর্টিষ্টিক্‌ ছবি যত দেয়ালে, বুঝতেই তো পারছ! আমার নামটা ছাড়া চারিদিকেই একেবারে আধুনিক আব্‌হাওয়া! এসব নিয়ে এখন কি করি, কোথায় যাই— আর কালই আবার তিনি আস্‌ছেন। দ্বিতীয় ভাগ না প্রথম ভাগে কোথায় যেন পড়েছিলাম, মাসি তুমিই আমার ফাঁসির কারণ—তাই বর্ণে বর্ণে সত্য হোলো দেখ্‌ছি।"

শশাঙ্ক বিস্তর সহানুভূতি প্রকাশ করল। তাতে কান না দিয়ে, চায়ের দাম না দিয়েই আমি বিমর্ষ মুখে রেস্তরাঁ ছেড়ে উঠে এলাম।

হপ্তাখানেক পরে আবার শশাঙ্কর সঙ্গে দেখা। সেই রেস্তরাঁতেই। আমি সরবৎ পান করছি—ঢাউস্ এক গ্লাস্ সরবৎ নিয়ে মনের দুঃখে অধোবদনে সিপ্ করছি—নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছি সাধ্যমত, এমন সময়ে শশাঙ্ক এসে হাজির।

"কি হে, কি খবর? তোমার সেই মাসি নিরাপদে এসে পৌঁছেচেন তো?" শশাঙ্ক আমাকে সম্ভাষণ করল।

"ত্যাখো, পাগলামির একটা সীমা থাকা দরকার। আইন্ করে' পাগ্লামি করার নির্দ্দিষ্ট একটা বয়স বেধে দেয়া উচিত। দেয় না কেন আমি তাই ভাবি।"

"য়্যাঁ, আমার পাগ্লামি হোলো? তুমি বলেছিলে বলেই আমার জিজ্ঞেস করা।" শশাঙ্ক ক্ষুণ্ণ হয়—বেশ, আমার ঘাট হয়েছে, মাপ করো।"

"তোমার কথা বল্‌ছিনে। একাত্তর বছর পেরিয়ে কেউ যদি—"

তোমার মাসির কথা বল্‌চ?" শশাঙ্ক বাধা দিয়ে বলে: তিনি আবার কি পাগ্লামি করলে্ন? তিনি তো শয্যাগত বলেই শুনেচি।"

"শয্যাগত?" আমি তপ্ত কণ্ঠে বলি: "শয্যাগতই বটে!

ষ্ট্রেচারে শুয়ে নয়, ফড়িংএর মতই উড়তে উড়তে বলা উচিত—ইষ্টিশন্ থেকে সটান্ হেঁটে এসে তিনি হাজির ! আধুনিক কায়দায় শাড়ী ব্লাউজ পরণে, মুখে হিমানী, ফেস্ পাউডার, এমন কি, পায়ে হাই হীল্ জুতো পর্য্যন্ত ! চেনাই যায় না মাসিকে বয়েস যেন চল্লিশ বছর কমে গেছে এম্‌নি চেহারা আর তেম্‌নি উৎসাহ !—"

"অ্যাঁ ?" শশাঙ্কর চোয়াল ঝুলে পড়ে।

"তবে আর বল্‌ছি কি ? এধারে গোদের ওপর বিষ ফোড়া—বিনি আর আমি, সারাদিন ধরে খেটে খুটে, প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ করে'—একেলে আস্‌বাবপত্র সব সরিয়ে সেকেলে সতরঞ্চি, আসন, পিঁড়ি এইসব আম্‌দানি করে' ঘরগুলোকে তো কোনোরকমে দময়ন্তীর যুগে এনে দাঁড় করিয়েছি —আর্টিষ্টিক্ ছবি আর আধুনিক সিনেমা ষ্টারদের হটিয়ে, শকুন্তলা, সূর্পনখা, সীতার পাতালপ্রবেশ ইত্যাদি সব সাজিয়ে গুজিয়ে রাখা হয়েছে—এমন কি, বান্নাঘরের দেয়ালে একখানা বড় সাইজের হনুমানের লঙ্কাকাণ্ড এনে টাঙিয়ে দিয়েছি পর্য্যন্ত—"

"কী সর্ব্বনাশ !" চোয়াল গুটিয়ে নিয়ে শশাঙ্ক বল্লে।

"সর্ব্বনাশ বল্‌তে ! আর তাই না দেখে তিনি এমন নাক উঁচু করলেন যে আমাদের ঘাড় হেঁট করতে হোলো। এ যুগে বাস করে' সেকেলে মেয়ের মত অপদার্থ হয়ে থাকার জন্যে বিনিকে কী যাচ্ছেতাই না তিনি করলেন ! আর আমাকে

বল্লেন কূপমণ্ডুক ! ঁ এবং এটা যে বিংশ শতাব্দী এই কথাটাই পুনঃ পুনঃ—অন্ততঃ উনবিংশবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন।"

"কী—সব্‌বো—নাশ্‌!" শশাঙ্কর আবার চোয়াল ঝুলে যায়।

"তবে রান্নাঘরের লঙ্কাকাণ্ডের ছবিটা মাসীর খুব পছন্দ হয়েচে। হনুমানের মুখখানা নাকি বুড়ো গঙ্গারাম ডাক্তারের মতো। সেই হতভাগা ডাক্তারই নাকি তাঁকে তিলে তিলে খুন্‌ করছিল। প্রায় নাকি মেরে এনেছিল—মাসীর নিজের মুখের কথাই বল্‌চি। খুব তাঁর বরাত জোর তাই গঙ্গাযাত্রার হাত থেকে বেঁচে গেছেন।"

"তাহলে তোমার মাসী কী করচেন এখন?" শশাঙ্ক জিগ্যেস্‌ করে।

"কী আর করবেন? সারাদিন টো টো করে' সহরময় ঘুরছেন। মিউনিসিপ্যাল্‌ মার্কেট থেকে একেলে জিনিষপত্র কিনে এনে ঘর দোর বোঝাই করচেন। নিজেকে সাজাচ্ছেন গোজাচ্ছেন আর আধুনিক লেখকদের উপন্যাস কিন্‌চেন—প্রেমেন মিত্তির ইত্যাদির। সারা রাত জেগে তাই পড়চেন, আর সারাদিন ধরে উঠে পড়ে বিনিকে মডার্ণ মেয়ে বানাতে লেগেচেন। বিনির তো প্রাণান্ত!"

"আহা!" শশাঙ্ক আমার বোনের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করে—"আর তোমার দশা?"

আমি শুধুই গৃহান্ত। বাইরে বাইরে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। তারপর শুন্‌ছি নাকি তিনি ন্যাশনাল্ ওয়ার্ ফ্রন্ট্ না কি জনযুদ্ধ না কিসে যোগদান করবেন! অল্‌রেডি মেয়েদের এ-আর্-পি-তে নাম লিখিয়েছেন। জাপানীদের না তাড়িয়ে তিনি ক্ষান্ত হবেন না। ঘোরতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

"তা উনি পারবেন, আমার বিশ্বাস। যোয়ান্ অব আর্কের মত—এই সত্তর বছরের যুবতীর পক্ষে—কিচ্ছু অসম্ভব না।" বল্ল শশাঙ্ক।—"কিন্তু এ রকম আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন কিসে হোলো, তাই ভেবে আমার তাক্ লাগছে।"

"আমার জন্যই।" সখেদে আমি জানালাম: "এককালে মোক্ষম্ রসায়ন বলে' একটা ওষুধের আমি বিজ্ঞাপন লিখে দিয়েছিলাম। পাঁজির পাতায় সেই রসায়নের প্রশংসাপত্র কবে জানি না মাসীমার চোখে পড়ে। আমার প্রশংসাপত্র দেখেই আরো তাঁর বিশ্বাস হয়। মোক্ষম্ রসায়ন হচ্ছে পাগলামির মহৌষধ। অন্ততঃ ওষুধওলারাতো তাই বলে রটিয়ে' থাকে। বিজ্ঞাপনটা পড়ে মাসীর হঠাৎ ধারণা হোলো যে গঙ্গারামের চিকিৎসাটা আসলে পাগলামি ছাড়া কিছু না। গঙ্গারামের পাগলামি—অথবা পাগলামির কুফল দূর করার জন্য মাসীমা ওষুধটা আনিয়ে খেতে আরম্ভ করেন। উচিত ছিল গঙ্গারামকে খাওয়ানো, কিন্তু তা না খাইয়ে নিজেই খেতে সুরু করে' দ্যান্। আর তার ফলে—"

"আর বল্‌তে হবে না, বুঝতে পেরেছি—সেই রসায়নের

ফলেই এই মোক্ষলাভ।” বলে’ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে শশাঙ্ক উঠে পড়ে, আমাকে কিছু আর বল্‌তে দেয় না। আমাকে সরবতের দাম না দেবার অবকাশ না দিয়েই উঠে যায়।



বন্ধুত্বের জলাঞ্জলি!

বন্ধু আমার বন্ধুই ছিল—সেদিন পর্য্যন্ত। তার বন্ধুত্ব এবং তাকে যে এক সঙ্গে আমায় জলাঞ্জলি দিতে হবে একথা কোনোদিন ভাবিনি। বন্ধুও ভাবেনি বোধ হয়। কিন্তু এই পৃথিবীতে অভাবিত কত কী-ই তো ঘটে থাকে, বন্ধুর স্থলে বন্ধুর অভাব হয়ত সেই রকমই একটা অভাবনীয় দুর্ঘটনা।

কে—কী—কেন—কবে—কোথায় ?—এই জাতীয় এক-খানা বই ক'দিন ধরে তার বগলে বগলে দেখছিলাম, তখন কি আর জানি যে ও তার সর্ব্বাধুনিক সংস্করণ হবার সাধনায় আছে। কিন্তু অচিরেই জানতে হোলো—এবং সেই জ্ঞান-লাভের সাথে সাথে আরো এই জানতে পারলাম ধরাধামে যে সব লোক জলাঞ্জলি যাবার জন্যেই জন্মেছে বন্ধু তাদের অন্যতম। আর তৎক্ষণাৎ তাকে জলে ফেলে দিতে দ্বিধা করলাম না।

জ্ঞানযোগের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মযোগ—এমন যোগাযোগ আমার জীবনে প্রায়শঃ ঘটে না,—কার জীবনেই বা ঘটে ?—কিন্তু বন্ধু-যোগে সমস্তটাই যেন বিদ্যুদ্বেগে ঘটে গেল। বন্ধু সেদিন কার্জ্জন পার্কে পেয়েছিল আমায়। দেখা মাত্রই তার প্রথম কথা : "আচ্ছা, ওই মনুমেণ্টটা যদি ভেঙে পড়ে —লম্বালম্বি হয়ে পড়ে যদি—তাহলে লাট সাহেবের বাড়ী পর্য্যন্ত তা পড়বে কি না, বল্‌তে পারো ?"

"কি জানি ! ওর শেষ ইঁটখানা হয়ত হাইকোর্টে গিয়েই

পৌঁছুতে পারে।" মানসাঙ্ক কষে' আমি জানাই ঃ "কোথায় ওর চূড়ান্ত হবে বলা যায় না তো।"

"তোমার ভুল।" বন্ধু আমায় বল্ল ঃ "কার্জ্জন্ পার্কের কিনারা অবধি আসবে কিনা সন্দেহ। এমন কি, আমার তো মনে হয়, উঁচুতে যতই হোক্, পড়তে গেলে নিজের চারপাশেই ওর ছড়িয়ে পড়তে হবে—নিজের পঞ্চাশ হাতের মধ্যেই স্তূপাকার হয়ে থাকতে হবে ওকে।…মাধ্যাকর্ষণ নেই ?"

'আচ্ছা বলো দেখি", বন্ধু আরম্ভ করল আবার ঃ "মনু-মেণ্টের মাথা থেকে কেউ যদি এখন তীর ছোঁড়ে, সে তীর কদ্দুর যেতে পারে বলে' তোমার ধারণা ?"

গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত ?" আমি প্রশ্নের সুরেই উত্তরটা দি।

'পাগল' গঙ্গা পশ্চিম দিকে না ? পশ্চিম দিক থেকেই বাতাস বইছে না এখন ? গঙ্গার দিকে তীর ছুঁড়লেও সে তীর হাওয়ার জোরে ঘুরে গিয়ে হোয়াইট্‌ওয়ে লেড্‌ল'র ছাতে এসে আটকে যাবে। বুঝেচ ?"

তারপর সে আমাকে বল্ল কলকাতায় এমন কোনো রাস্তা নেই যার কোনো না কোনো জায়গা থেকে একটা না একটা গাছ চোখে না পড়ে। আবার আমি মাথা ঘামাই, আমার মনে মনেই। যতগুলো রাস্তা আমার ধারণায় ছিল আর আমার মনে পড়ল, একে একে মন দিয়ে দেখবার চেষ্টা করি—কিন্তু বন্ধুর কথাই ঠিক—যেমন যেমন সেই রাস্তাগুলো আমার

মানসপটে উদিত হতে থাকে, তার কোথাও না কোথাও একটা না একটা গাছ আমার মনশ্চক্ষে পড়ে যায়।

"বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে কটা রেস্তরাঁ—জানা আছে ?" সে জিজ্ঞেস করল আমাকে।

আমি বল্লাম ঃ "তিনটে।"

সে বল্লে ঃ "উহুঁ, দুটো। তৃতীয় যেটাকে তুমি আন্দাজ করছ, সেটা কলেজের কাছে নয়, একটু দূরে, ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে ওধারে। আর আজকাল যে রকম মিলিটারী লরীর হুড়ো, ট্রাম রাস্তা পেরুতে গিয়ে ওটা যে তুমি পাবে তার ঠিক কি ? রেস্তরাঁ-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই তোমার মিলিটারী-যোগ ঘটতে পারে।"

সে জিজ্ঞেস করল, "হাওড়া ষ্টেশনে কটা প্লাট্ফর্ম্ম শুনি ?"

আমি বল্লাম, "সতেরটা।" আন্দাজেই বল্লাম অবশ্যি। এবং আবার ভুল হোলো। এবং সেই দণ্ডেই ওকে জলাঞ্জলি দেবার বাসনা আমার হৃদয়ে বলবৎ হোলো।

"আচ্ছা, এ আর পি-রা পুলিশের মত বেল্ট লাগায় কিনা তোমার জানা আছে ?" জিজ্ঞেস করল সে ?

আমার উত্তর ভুল হোলো, আবার যেমন হয়ে থাকে।

"আচ্ছা, পুলিসরা কোথায় বেল্ট লাগায় ?"

"স্বদেশীওলাদের পিঠে ?"

"তোমার মাথা। নিজেদের কোমরে। কেন, কখনো চোখেও ছ্যাখোনি ?"

সত্যি বল্‌তে, কক্ষণো না। পুলিস দেখলেই আমি পালিয়ে যাই। কবে যেন একবার কোন্‌ হুজুগে বন্দে মাতরম্‌ বলে’ চ্যাঁচাতে গিয়ে পুলিসের ঐ বেল্‌ট্‌ নিজের পিঠের ওপর দেখেছিলাম—তারপর থেকে পুলিস এবং বেল্‌ট্‌ পরস্পর কি ভাবে সম্বদ্ধ তা দেখবার জন্যে মুহূর্ত্তমাত্র দাঁড়াইনি।

“আচ্ছা, বাসের কণ্ডাক্‌টার্‌রা কোন্‌ ধারে তাদের ব্যাগ্‌ ঝোলায়—বল্‌তে পারো?”

আবার আমার ভুল হোলো। হবার কথাই। ভালো ভালো পিক্‌পকেট্‌রাই এর নিখুঁত উত্তর দিতে পারবে--যারা ঐ ঝোলা বাগাবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করছে। বাসে উঠ্‌লে, যাত্রী ভর্ত্তির ফাঁকে কোথায় একটা খালি সীট্‌ এবং কোন্‌ সীট্‌টা খালি মেয়েদের নয় সেই দিকেই আমি নজর দিই, কণ্ডাক্‌টারের ঝোলানো ব্যাগের কথা আমার মনেই থাকে না।

“বলো দেখি, এটা পারো কিনা? ধর্ম্মতলা-চৌরঙ্গীর মোড় থেকে পার্ক ষ্ট্রীট্‌ কাছে, না, ধর্ম্মতলা-মৌলালির মোড় থেকে পার্ক ষ্ট্রীট্‌ কাছে?”

বলা বাহুল্য, এবারও আমি সদুত্তর দিতে পারলাম না।

“আচ্ছা, এই কার্জ্জন্‌ পার্ক থেকে কোন্‌ পথে সব চেয়ে চট্‌ করে’ লেকে পৌঁছনো যায়? লেকে তো তোমার যাতায়াত আছে, এটা তুমি বল্‌তে পারবে নিশ্চয়?”—বন্ধু আমায় ওস্‌কালো।

অনেক ভেবে চিন্তে একটা পথ আমি বার করলাম। ওর চেয়ে শর্টকাট্ আর হতে পারে না। বন্ধু কিন্তু হাস্‌তে লাগ্‌ল হি হি করে'—"এই তোমার সোজা পথ? হা হা হা।"

"এর চেয়ে সোজা পথ আছে নাকি?" এবার আমি চটে যাই।

"তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হলে সব চেয়ে সোজা পথ হচ্ছে ট্যাক্‌সি।" বন্ধু আবার ফ্যা ফ্যা করে' হাস্‌তে স্নুরু করে।

আমার অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল। আমি বল্লাম- "এবার আমার পালা। আমি জিজ্ঞেস করব তোমায়।"

"স্বচ্ছন্দে। তোমার যা খুসি। কলকাতা কেন—এই পৃথিবীর যেখান থেকে খুসি! বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কোনো কিছু আমার অজানা নেই।"—

এই বলে বন্ধু আবার বিমল-হাসি হাসতে থাকে।

"আচ্ছা,, লেকের সেই পুলের ওপর থেকে ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখা যায় কি যায় না?"

"যায় না।" বল্ল বন্ধু।

আমি বল্লাম: "যায়।"

"কক্ষনো না।" বল্ল বন্ধু। "কি করে' দেখা যাবে?"

আমি বল্লাম: "লেক্ তো খুব দূরে নয়। ট্যাক্‌সিও রয়েছে—সোজা পথ সামনেই। গিয়ে দেখলেই হয়, দেখা যায় কিনা।"

বঙ্কু বল্ল "বেশ, তাই হোক্, দেখবার ভার এবং ভাড়া তোমার।"

ট্যাক্সিতে যাবার সময়ে বঙ্ক আবার তার বিদ্যার বহর বিস্তার করতে লাগল। ট্যাক্সির নম্বর আর ড্রাইভারের লাইসেন্স নম্বর এক কিনা জিজ্ঞাসা করল আমাকে। আমি বল্লাম, "এক।" ও বল্ল, "না।" ও আরো বল্ল, "বলো তো আমি ড্রাইভারের কাছ থেকে যাচাই করে জানিয়ে দিচ্ছি এখনই।" আমি কিছু বল্লাম না। যাচাই করে' আর কি হবে? আমার যা বল্‌বার, যা আমি চাই, লেকের সেই পুলের ওপরেই বলা যাবে। দূর তো নয়। দেরি কি?

অবশেষে আমরা লেকের কাছে পৌঁছলাম। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালাম গিয়ে পুলের ওপর। বঙ্কুকে ধার ঘেঁষে দাঁড় করিয়েছি—ঠিক মাঝখানে। এক ধাক্কায় জলে ফেলে দেবার পক্ষে এমন আদর্শস্থল বোধ হয় আর নেই। হতভাগা কিন্তু হাসছে তখনো।

"দেখাও তো আমাকে, এখান থেকে কোথায় তোমার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল্ দেখা যায়।" বলে' আবার হ্যা হ্যা করে' হাসতে লাগল।

"এই যে দেখাচ্ছি।" বলে' এক ধাক্কায় বলতে না বলতে বঙ্কুকে লেকের গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়েছি।

দুঃখের বিষয়, পড়বার সময় আমাকে টেনে নিয়ে ও জলে পড়ল। আরো দুঃখের কথা, ওকেই আবার আমায় টেনে

তুল্‌তে হোলো। ও-ই আমাকে জল থেকে—সলিল-সমাধি থেকে উদ্ধার করল। যেমন অনেক কিছুই আমি জানিনে, তেমনি বলব কি, সাঁতারও আমার জানা ছিল না।

এর পর আর বন্ধুর সঙ্গে কি করে' বন্ধুত্ব রাখা যায়? তোমরাই বলো?



"হরিনাথবাবু ক্ষেপেছেন আবার!" ফিস্‌ফিসিয়ে বল্লেন, সেকেন্ পণ্ডিত।

হরিনাথবাবু আমাদের স্কুলের হেড্‌মাষ্টার—এবং হেড্‌-মাষ্টারের পক্ষে কতদূর ভালো হওয়া সম্ভব তিনি তার অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তিনি ছেলেদের শাসন করতে জানেন না। অবিশ্যি আর, যারই হোক্, এটা আমাদের—ছেলেদের দুঃখের বিষয় নয়। তবে ছাত্রদের তাড়না করবার প্রেরণা নেই বলে' আর সব মাষ্টাররা আপ্‌সোস্ করেন। আপ্‌সোস্ করেন আর নিস্‌পিস্ করতে থাকেন, এমন কি, এ-স্কুলে মাষ্টারি করে' আর কী লাভ, এমন কথাও সময়ে-অসময়ে তাঁদের মুখ ফস্‌কে শোনা যায়।

এবার, কলকাতার শিক্ষক-সম্মেলনের ফের্‌তা হরিনাথ-বাবু নতুন এক আইডিয়া মাথায় করে' এসেছেন। তাঁর মতে, আইডিয়া; অন্যান্য মাষ্টারের মতে—আরেক তাঁর খেয়াল। তাঁর ধারণায়, আমাদের জীবনে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা না থাকায় সব উৎসাহ জুড়িয়ে জল হয়ে যাচ্ছে। এই জন্যে মাঝে মাঝে এক আধটা জলসা হওয়ার দরকার।

সেকেন্ পণ্ডিত বলেছেন—"এটাও তাঁর সেই ব্যাট্‌বল্ খেলার মত হবে।"

হ্যাঁ, এর আগের বারে তিনি ক্রিকেটের আইডিয়া নিয়ে ফিরেছিলেন। ঠিক মাথায় করে' নয়, কিম্বা মাথায় করে' বল্লেই বোধ হয় ঠিক হয়। এক রাজ্যের উইকেট্, বল্, ব্যাট্,

পায়ে-পরা প্যাড ইত্যাদির বোঝা নিয়ে যখন তিনি ফিরলেন, তখন বলতে কি, আমাদের বেশ উৎসাহই হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল বল্‌গুলো এক মণ করে' ভারী, ছুড়তে ছুড়তে হাত ব্যথা হয়ে যায় আর তিন দিন ধরে সেই ব্যথা যথাস্থানে জমে থাকে, আর এধারে যতই কায়দা করে' ছোড়াছুড়ি করো না কেন, উইকেটের এক মাইলের মধ্যে দিয়ে কিছুতেই তারা যাবার পাত্র না, তখন আমাদের সব উৎসাহ জল হয়ে গেল। তার ওপরে আবার ব্যাটের দুর্ব্ব্যবহার আছে, একজন ব্যাট্‌কীপার—ব্যাট্‌কীপার ছাড়া আর কীই বা বলা যায়?—কখনো ব্যাট্‌ দিয়ে তো ওকে একখানা বলের প্রতিও বল-প্রয়োগ করতে দেখা যায় না—হ্যাঁ, একদিন একজন ব্যাট্‌কীপার্‌ করল কি, একটা আগন্তুক বল্‌কে হাঁক্‌ড়াতে না গিয়ে—বল্‌ তার দেড় মাইল দূর দিয়ে যাচ্ছিল—নিজের মাথায় ব্যাট্‌ মেরে বস্‌ল। নিজের কপালে ব্যাটাঘাতেও তেমন কিছু ক্ষতি ছিল না, সে কর্‌ল কি, ঘুর্‌তির মুখে, সেই ব্যাট্‌ দিয়েই উইকেট্‌কীপারের এক পাশের এক গাদা দাঁত খসিয়ে দিলে। আমরা খুব চটে গেলাম। চট্‌বই তো, আমাদের সন্দেহ হোলো, হেড্‌মাষ্টার মশাই হাতে না মেরে এই ভাবে ব্যাট্‌বলের সাহায্যে আমাদের দুরস্ত করছেন! দাঁতে মারছেন আমাদের! উইকেট্‌ আর ব্যাট্‌কীপার দুজন সেই ধাক্কায় সেই যে শয্যা নিল আর তারা উঠ্‌ল না। ক্রিস্‌মাসের ছুটি পর্য্যন্ত তারা পাল্লা দিয়ে

বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দিলে, তারপর তারা সেই ক্রিকেটের দৌলতেই ক্লাস্ প্রমোশন আদায় করে' (আফ্‌টার্ অল্ ইট্ ওয়াজ্ নট্ ক্রিকেট্ !)—রুগ্ন শয্যা পরিত্যাগ করে' লাফাতে লাফাতে বাড়ী চলে গেল। ফিরে এল ছুটি খতম্ করে', নতুন বছরে—এসেই তারা ফের ক্রিকেট খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু ক্রিকেট তখন কোথায় ? আমরা ব্যাট্, বল্, পায়ে বাঁধা প্যাডের বালিশ সবশুদ্ধু—(মাথায় যখন বল্‌রা ব্যাট্‌রা এসে লাগে তখন নাহক্ পায়ে বালিশ জড়িয়ে ফল ? —হতে হলে আপাদমস্তক বালিশ-বন্দী হতে হয়)—সর্ব্বসমেত পদ্মার গর্ভে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেচি। বস্তুতপক্ষে, ক্রিকেটকে, তারা দুজন ছাড়া আমরা কেউই যখন ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলুম না—ক্রিকেট নিজগুণে আপনা থেকেও আমাদের কারো কাজে যখন লাগ্‌ল না—আর কোনো কারুকার্য্যই হোলো না যখন ওকে দিয়ে—তখন আর অনর্থক গায়ের ব্যথা বাড়িয়ে লাভ ?

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমার কি মনে হয় জানেন ?" হেড্-মাষ্টার মশাই অন্যান্য মাষ্টারদের ডেকে জানালেন ঃ "এই রকম প্রায়শঃ জল্‌সা প্রভৃতির দ্বারা কেবল যে ছেলেদের জীবনে উদ্দীপনা বাড়ানো হবে তাই নয়, এতে করে' পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের ফলে শিক্ষক ও ছাত্রর সম্বন্ধ আরো মধুরতর হয়ে উঠ্‌বে। তাদের সদ্ভাবও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে।"

এই ছোট্ট বক্তৃতাটি দেবার পরই তিনি আমাদের ডাক্ করে' একটা প্রশ্ন ছুঁড়লেন—"এখন তোমরা কে কি করতে পারো বলো দেখি?"

আমরা এতক্ষণ ধরে' একজোট্ হয়ে তাঁর বক্তব্য থেকে জল্সার ব্যাপারটা কী জেনে নৈবার চেষ্টা কর্‌ছিলাম—জল্সা হলেও জলের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই, এমন কি, জলযোগের সঙ্গেও সম্পর্ক নেই কোনো—না-যাত্রা না-থিয়েটার না-ভোজবাজি—অথচ সব কিছুর গর্‌মিল্ এই বিষয়টা ধীরে ধীরে আমাদের কাছে প্রাঞ্জল হয়ে আসছিল তখন।

"আমি হয়ত গান গাইতে পারি।" সাহস করে' আমি বল্লাম।

"আমরাও সেই ভয় করেছি।" বল্লেন হরিনাথবাবু: "বেশ, তুমিই তাহলে এই সব কাণ্ডের কর্ম্মকর্ত্তা হলে। তোমাকেই মনিটার করে' দিলুম। তুমি যখন গান গাইতে পারো তখন তোমার অসাধ্য কিছু নেই। তুমি সব পারবে।"

তারপর তিনি আমাদের বাদবাকীদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতে লাগলেন।—"কী, তোমাদের কেউ হারমোনিয়ম্ বাজাতে জানো নাকি?"

"আমি সার্, একটা টেনিস্‌বল্ আমার দাড়ির ওপর দাঁড় করিয়ে রাখ্‌তে পারি।" বল্ল ফটিক: "হাত দিয়ে ধরা নেই, ছোঁয়া নেই, ভারী শক্ত।"

"আমি হারমোনিয়ম বাজাতে জানিনে বটে, তবে বাজালে

বাজাতে পারব।" বল্ল রহমান্।—"যদি হারমোনিয়ম পাই আর যদি সেটা বাজতে চায়।"

"কী বাজাবে?" হেড্মাষ্টার মশাই আগ্রহান্বিত হলেন: "কোনো গৎ টৎ জানা আছে তোমার? কন্সার্টের মত একটা কিছু না হলে জল্সা জম্বে কেন?"

"হ্যাঁ, গৎ জানি বই কি সার্!" রহমান অম্লানবদনে জানালো। "আকাশের চাঁদ ছিলরে'—এই গৎটাই আমি বাজাব।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলেন হরিনাথবাবু। "ঐটেই কেন?"

"এই গৎটাই আমি জানি যে।" বল্ল রহমান্: "এ ছাড়া আর কোনো গৎই আমার জানা নেই।"

"ওকে ওইটেই বাজাতে দিন্ সার্। ও বেশ ভালোই বাজাবে।" ফটিক সায় দিয়ে বল্ল: "ও কালো ঘর গুলোও বাজাতে পারে আমি দেখেছি। কালো ঘর বাজানো ভারী কঠিন।"

ছোট্ট মুকুল, এক পাশ থেকে বলে' উঠ্ল হঠাৎ: "আমি বেশ ভালো হাঁস ডাক্তে পারি কিন্তু।"

"দেখাও আমাদের"—হুকুম্ করলেন হেড্মাষ্টার।—"ডেকে দেখাও।"

মুকুল একে ছোটো তার ওপরে একটু লাজুক, সহসা এই আক্রমণে কেমন বিব্রত হয়ে পড়ল। কোনো শিল্পীকে যদি

তড়িঘড়ি তার শিল্পসাধনার পরিচয় দিতে হয়—তার নিজ নৈপুণ্য প্রকট করার যতই প্রবল বাসনা থাক্না এবং যত বড় শিল্পীই হোক্ না কেন, স্বভাবতই একটু না ঘাব্ড়ে গিয়ে পারবে না।

মুকুল হাঁস ডাক্তে ইতস্ততঃ করে।

"কই, তোমার হাঁসের ডাক শুনি।" হেড্মাষ্টার মশাইও ছাড়বার পাত্র নন্—শোনার জন্য তিনি হাঁস্ফাঁস্ করতে থাকেন।

"প্যাঁক্—প্যাঁক্—প্যাঁক্"—ডাকল মুকুল।

এবং একবার কোনো শিল্পী উস্কে উঠ্লেই মুস্কিল। তখন তার প্যাঁক্ প্যাঁকানি থামানো যায় না।

"থামাও তোমার হাঁসের বাঁশি।" ভ্রুকুঞ্চিত করে' বল্লেন হেড্মাষ্টার।

যাই হোক্, কোনো রকমে একটা প্রোগ্রাম্ তো খাড়া করা হোলো—

ফাজিলাবাদ ইস্কুলের ছেলেদের

—সম্মিলিত জলসা—

হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের ঃ বক্তৃতা

শ্রীমান্ মুকুল মৈত্র ঃ হাঁসের ডাক

হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের ঃ বক্তৃতা

রহমানের হারমোনিয়ম্ কন্সার্ট্ ঃ

('আকাশের চাঁদ ছিল রে!')

ফটিক চন্দ্রের ঃ ম্যাজিক

(হাতে ধরা নেই, ছোঁয়া নেই, ভারী শক্ত)

—ইন্‌টার্‌ভ্যাল্ –

চকর্‌বর্‌তির গানের গুঁতো ঃ

'সেথা আমি কী গাহিব গান !'

সেই সঙ্গে

রহমানের হারমোনিয়ম্-সঙ্গত্

('আকাশের চাঁদ ছিল রে' !)

ফটিক চন্দ্রের পুনশ্চ ম্যাজিক

শ্রীমান্ মুকুল মৈত্র ঃ—আরো হাঁসের ডাক

হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের আবার বক্তৃতা

অবশেষে

বন্দে মাতরম্

মনিটার হিসেবে জল্‌সার উদ্যোগ-আয়োজনের সব ভার আমার ওপর। আমাদের ছোট্ট টাউনের একমাত্র সিনেমা হাউসটি আমি ভাড়া করে ফেল্লাম। কিন্তু মুকুল বল্লে, "এই ছোট্ট হলে আমাদের সবাইকে ধরবে না সার্।"

মুকুল অবিশ্যি খুব ছোট্ট আর আমি নিশ্চয়ই খুব বড়ো, ফার্স্ট্ ক্লাসেই পড়ি যখন, তবু মুকুলের এই অপ্রত্যাশিত সম্বোধনের সারাংশে সদ্যলব্ধ মনিটারির আত্মপ্রসাদে আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম। কিন্তু ও-ছাড়াও, মুকুলের মন্তব্য অন্য দিক দিয়েও সারগর্ভ বই কি! ঠিক কথাই বলেছে ও,

কিন্তু সারা টাউনে এই একটি মাত্র পাব্লিক্ হল্—অথচ এর মধ্যে স্কুলের আদ্ধেক ছেলেকেও গুঁতো গুঁতি করে' আঁটানো যায় কিনা সন্দেহ।

সমস্যাটা হেড্মাষ্টার মশায়ের কাছে এনে উপস্থিত করা হোলো।

তিনি বল্লেন: "তাতে কি হয়েছে? জল্সা তা বলে' বন্ধ করা যায় না। আদ্ধেক ছেলেই দেখ্বে—কি করা যাবে? কারা দেখ্বে, তোমরা নিজেদের মধ্যে লটারি করে' ঠিক করে' নাও।"

এ ব্যবস্থা, বল্তে কি, ছেলেদের বেশ মনঃপূত হোলো। ছেলেরা লটারি করতে যেমন ভালোবাসে তেমন আর কিছু না। এমন কি ফুটবল্ খেলার গোলটা ঠিক ঠিক হয়েছে কি না, সে বিষয়েও তারা রেফারির চেয়ে লটারির ওপরেই বেশি নির্ভর করে।

অবশেষে সেই জল্সা-রজনী এল। প্রত্যেকেই উৎসাহে আগ্রহে অধীর। ফটিকচন্দ্র তার বল্-ক্রীড়া নিখুঁৎ করবার আয়োজনে চোখ খইয়ে ফেল্ছে। সন্ধ্যে থেকেই সবলে সে শেষ-চেষ্টায় লেগেছে। মুকুল ষ্টেজের পেছনে গিয়ে নেপথ্য থেকে হংসধ্বনির রিহার্সাল্ দিচ্ছিল। আর রহমান এদিকে হারমোনিয়ম নিয়ে (সাদা কালো সব ঘরেই সে হাত চালাতে সমান ওস্তাদ্) ক্ষেপে উঠেছিল—'আকাশের চাঁদের' ভেতর থেকে সে এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত সুর বার করে' এনেছে যা সে

কোনোদিন পারবে বলে' আশা করতে পারেনি। চল্‌তি সিনেমার সমস্ত চালু সুরকে সে ওই একটামাত্র গতের মধ্যে এক সঙ্গে আমদানি করতে পারছিল।

আমার নিজের গানটাও এক আধ বার ভেঁজে নেবার দরকার ছিল কিন্তু রহমানের অত্যাচারে তার ফাঁক পাচ্ছিনে একটুও। রহমান রপ্ত করেই চলেছে, ওর সুরের আমদানি-রপ্তানির বহরে এধারে আমার তো যায়-যায় অবস্থা। ওর সঙ্গতের সঙ্গে আমার সঙ্গীত যে কি করে' খাপ খাওয়াবো তাই ভেবে আমি কাহিল হচ্ছি। আমার গানের সাথে, রচনার ভাষাতেই, একটু সাফাই দেয়া আছে এইটুকুই যা আমার সান্ত্বনা।...

সবাই কৌতূহলে উদ্দীপ্ত, হেড মাষ্টার মশাইও কারো চেয়ে কিছু কম নন্‌—কিন্তু দর্শকদের মধ্যে কেমন যেন লালসার অভাব! কি রকম যেন মনমরা-মনমরা ভাব' এমন একখানা জল্‌সা— এখানে এই শতাব্দীতে এই প্রথম—তার সঙ্গে জলযোগের কোনো সম্পর্ক নাই বা থাক্‌ল, তা বলে' ছেলেদের স্বভাবসুলভ উৎসাহ লোপ পাবে, এই বা কেমন?

ছেলেরা ম্রিয়মাণ মুখে একে একে সিনেমা হলে ঢুকছিল। ঠিক যেমন করে' পাঁঠারা খাঁড়ার তলায় দাঁড়ায়। তাদের হৈ হুল্লোড় কিচ্ছু নেই, টিকেট্‌ করে' সিনেমা দেখার সময়ে অন্ততঃ যতটা দেখা যায় তার একশ ভাগের এক ভাগও এই বিনে-পয়সার জল্‌সার বেলায় কেন দেখা যাচ্ছে না, এটা একটা বিস্ময়ের বিষয় বলেই বোধ হতে লাগল।

ব্যাপার কি, জানতে আমি উদ্‌গ্রীব হলাম।

হেড্‌মাষ্টার মশায়ের দৃষ্টি অতিশয় যে তীক্ষ্ণ তা বলা যায় না, কিন্তু তাঁর নজরেও কেমন যেন এটা খোঁচাচ্ছিল। তিনি মুখে কিছু বল্‌ছিলেন না বটে, কিন্তু একটা প্রশ্ন-পত্র চোখে নিয়ে ঘুরছিলেন। অবশেষে সেকেন্‌ পণ্ডিতকে সাম্‌নে পেয়ে তিনি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। খচ্‌ খচ্‌ করে' উঠ্‌লেন।

"কী হয়েছে মশাই? ছেলেরা সব মুখ কালো কালো করে' আস্‌ছে কেন? লটারিতে কি কোনো গোলমাল—?"

"কিছু না। গোলমাল কি হবে? লটারিতে গোলমালের কি আছে?"

"যাক্‌, তবু ভালো।" দিল্‌দরিয়া একখানা হাসিতে হরিনাথবাবুর সারা মুখ ভরে গেল: "লটারিতে কোনো ত্রুটি হয়নি যে তবু ভালো। আপনার ওপর যখন লটারির ভার দিয়েছিলাম তখনই জানি সুষ্ঠুভাবে ওটা আপনি সুসম্পন্ন করবেন। যাক্‌, কারা কারা লটারি জিতেছে দেখা যাক্‌।"

"উঁহু, আপনি একটু ভুল করছেন।" হেড্‌মাষ্টারের কানে কানে ফিস্‌ ফিস্‌ করলেন সেকেন্‌ পণ্ডিত, সে ফিস্‌ফিসানি আমার কান অবধি এসে পৌঁছল। "এর মধ্যে লটারি-জেতারা কেউ নেই। তারা সবাই হোসটেলে পিক্‌নিক্‌ করছে এখন। এরা লটারি-হারার দল।"



ইঁদুরদের দূর করো!

আমার জীবনস্মৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন-করা একটি পৃষ্ঠা—এক ছিন্নপত্রের কাহিনী এখানে বলব। আমার জীবন স্মৃতির সঙ্গে এই ছিন্নপত্রটি জড়ানো।

সবে ইস্কুল ছেড়ে মফস্বলের এক কলেজে ঢুকেছি—হোষ্টেলে থাকি। এক এক ঘরে চারজন ছ'জন আটজনের সীট্। সীটের পাশেই পড়ার টেবিলের ওপরে আমাদের বইগুলি ইতস্ততঃ ছড়ানো, কিম্বা এখানে ওখানে পুঁজি করা। অথচ কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত, আমাদের কাছে পড়ার বইয়ের কী মর্য্যাদাই না ছিল! ইস্কুলে পড়তে, ছোট্ট টেবিলের ওপরে, আমাদের বইগুলি মলাটের ওপর খবরের কাগজের মোড়ক পরে সুসজ্জিত হয়ে শোভা বিস্তার কর্তো, এখনো মনে পড়ে। কেউ যদি তখন খবর-কাগজের বদলে, দেয়াল-ক্যালেণ্ডারের বাতিল-করা পাতায় পড়ার বই মোড়ার সুযোগ পেয়েছে তার সৌভাগ্যকে অকপটে আমরা ঈর্ষা করেছি। কিছুদিন আগেও, বইয়ের চেয়ে তার জড়োয়া গয়নার দামই বোধহয় বেশী ছিল। অবশ্যি বইয়ের খাতিরেই—কিন্তু এখন? এখন মলাট দূরে থাক্, বইয়ে পর্য্যন্ত ভ্রূক্ষেপ করার আমাদের ফুর্‌সৎনেই। বইয়ের চেয়ে তার নোটের দামই এখন বেশী আমাদের কাছে।

কিন্তু সে কথা নয়, সে দুঃখ জানিয়ে কি হবে, পুঁথিপত্র ছেড়ে এখন আমাদের গল্পের ছিন্নপত্রে যাওয়া যাক্—

একদিন সকালে আমার ছোট্ট টেবিলটার ওপর ঝুঁকে—

আগের রাত্রে যে এক্‌স্ট্রা-টা কিছুতেই কষ্‌তে পারিনি তাই নিয়ে কাতর হয়ে রয়েছি এমন সময়ে—

ঢং ঢং—ঢঢাং ঢং ঢঢাং ঢং .....

সকাল সাতটা না বাজ্‌তেই খাবারের ঘণ্টা ?

তবু, খাবারের ঘণ্টা হচ্ছে খাবারের ঘণ্টা—তা ভোর ছ'টাতেই হোক্‌, বা দিনে ছবার করেই হোক্‌—কিম্বা দিন ভোরই হতে থাক্‌ ! তাকে grudge করবার—গ্রাহ্য না করবার আমাদের ক্ষমতা ছিল না। কেননা, আমাদের পেটে খিদের ঘণ্টা সব সময়েই বাজ্‌তো।

ঘণ্টাধ্বনি কানের ভেতর দিয়ে মরমে ভালো করে' প্রবেশ করতে না করতেই, সব ছেলে আমরা, সোরগোল করে' হোষ্টেলের হেঁসেল ঘরে গিয়ে হাজির।

কিন্তু না, দুঃখের বিষয়, খাবার ঘণ্টা নয়।

হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিজের কি এক দরকার পড়েছে তাই তিনি ঘণ্টার মারফতে সমবেত আমাদের উদ্দেশে এই ভাবে হাঁক ডাক ছেড়েছেন। সেই কারণেই এই এক চিঠিতেই সকলের আমন্ত্রণ !

খাবারের ঘণ্টা নয়—বরং খাবারের বেলায় ঘণ্টা ! ভারী দমে গেলুম। ভোগ নেই কিছু নেই, তেমন ঘণ্টাকর্ণপূজায় আমাদের উৎসাহ নেই—সার্ব্বজনীন হলেও না। ভারী মন খারাপ হয়ে গেল। বেয়ারিং পোস্‌টে ফের যে নিজের বিছানায় ফিরে আস্‌বো—যথাস্থানে ফেরৎ এসে চিৎপাত হয়ে

মনের দুঃখ লাঘব করব তারও যো নেই—ঠিকানা বদ্‌লি হয়ে ক্ষুণ্ণ-মনে সবাইকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে গিয়ে জমা হতে হোলো।

''দেখেচ? দেখেচ কাণ্ডখানা? ইঁদুরের বাঁদ্‌রামিটা দেখেচ একবার?—"

যাবামাত্রই, এই প্রশ্ন মুখে করে' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাই আমাদের সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন।

এবং বলতে না বলতে, ইঁদুরে-কুরে-খাওয়া, প্রায় সাড়ে তিনভাগ সাবড়ে-দেয়া, একখানা খামের চিঠি আমাদের সবার নাকের সাম্‌নে তিনি তুলে ধরলেন।

"দেখেচ! চিঠিখানার কিছু রাখেনি! হাড় পাঁজরা ঝর্‌ঝরে করে' দিয়েচে! আগাপাশতলা সব খতম্‌! দ্যাখো দেখি একবার! চেয়ে দ্যাখো!"

আমরা, রবীন্দ্রনাথের কৃত নয়, ইঁদুরের কাণ্ড—সেই ছিন্ন-পত্র—উক্ত দুষ্কৃতকর্ম্ম দুচক্ষে নির্নিমেষে তাকিয়ে দেখলাম। আহত খামখানাকে খামোখা দুঃখের ভান করে' দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

"আমার বাড়ীর চিঠি! পারিবারিক চিঠি আমার। ভয়ঙ্কর জরুরি চিঠি! এখনো এর জবাব দেয়া হয় নি—দ্যাখো তো কীক্‌—কাণ্ড!"

"খারাপ! খুবই খারাপ!" আমাদের মধ্যে থেকে মনি-টার বলে' উঠ্‌ল আগে: "ইঁদুদের এ খুব অন্যায় কাজ একথা বল্‌তে আমি বাধ্য।"

"ইঁদুরদের এটা উচিত হয়নি।" আমিও না বলে' থাকতে পারিনে ঃ "খামটার ওপরে কি 'প্রাইভেট' বলে' কিছু লেখা ছিল না নাকি ?"

"থাক্‌লেই বা কি ? কী তাতে ? ইঁদুররা কি প্রাইভেট পার্সনাল, এসব কিছু মেনে চলে ?" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার কথায় ভারী খাপ্‌পা হয়ে উঠ্‌লেন ঃ "তারা কি ইংরেজি পড়তে পারে ? না, পড়লে বুঝতে পারে ? মাথামুণ্ডু সাহিত্যের কোনো কিছু কি বোঝে ওরা ?"

"ওর কথা ধরবেন না সার্‌। ও নেহাৎ ছেলে মানুষ।" বল্লে মনিটার।

"হায় হায় ! এখন আমি কী যে করি। কী করে' এর উত্তর দিই ! কী যে জবাব দেবার ছিল, চিঠিটার বিন্দু বিসর্গ কিছুই আমার মনে নেই—কিচ্ছু মনে পড়ছে না ! চিঠিটার ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে গেছি কেবল,—কে জানে এমন হবে ! প্রকাণ্ড একটা কেনাকাটার ফর্দ্দ ছিল এইটুকুই শুধু স্মরণে আছে !"

ইঁদুরদের অমানুষিক আচরণে, ইতর প্রাণীসুলভ এই নিতান্ত অভদ্রতায়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাই এমনই কাতর হয়ে পড়েন যে মর্ম্মাহত সমস্ত ছেলের সমবেদনা, আমার সহানুভূতি, মনিটারের সান্ত্বনা কিছুই তাঁকে শান্ত করতে পারে না।

বিস্তর হাহুতাশের পর অবশেষে তিনি প্রকাশ করেন— "কিন্তু বারম্বার এরকম হলে তো চল্‌বে না। জরুরি চিঠিপত্র

সব আমার ! কখন্ আসে তার ঠিক নেই, ইঁদুরদের তাড়াবার তোমরা ব্যবস্থা করো !—

এতদিন আমরা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের রুদ্র মূর্ত্তিই দেখে এসেছি, তাঁর বীরোচিত হাবভাব দেখতেই অভ্যস্ত ছিলাম, সামান্য একটা পত্রের বিরহে তাঁর যাবতীয় বীরত্ব যে এভাবে খসে পড়বে, সমস্তটা এতখানি করুণ হয়ে দেখা দেবে তা কে ভাবতে পেরেছিল ?

কিন্তু আস্তে আস্তে তাঁর বীর-রস ফিরে আসতে থাকে—হঠাৎ তিনি ভয়ঙ্কর চোট্পাট্ করে' ওঠেন ঃ

—"না—না—না ! ওসব কথা শুন্‌ছিনে ! ইঁদুরদের দূর করো। এক্ষুনি তাড়াও ওদের। মেরে ধরে যেমন করে' পারো ভাগাও ! আগে ওরা বিদায় নেবে তারপরে আমি জলগ্রহণ করব।"

মনিটারকে লক্ষ্য করে' কেবল এই হুকুম্ই নয়, একটা হুম্‌কিও তিনি ত্যাগ করলেন।

"আজ্ঞে—আজ্ঞে—কি করে' তাড়াব ?" মনিটার ভারী কিন্তু-কিন্তু হয়ে পড়ে। —"ওরা কি যাবার ?"

"নোটিশবোর্ডে একটা নোটিশ্ লটকে দিলে হয় না ?" কে একজন বলে' ওঠে আমাদের ভেতর থেকে।

"তাছাড়া, তাড়ালে কি ওরা যাবে ? মানে, মানে—তাড়ানো কি যাবে ওদের ?"

মনিটার আম্‌তা আম্‌তা করে' বলবার চেষ্টা পায়। ওর

মনের সংশয় ওর চোখে মুখে আর প্রত্যেক কথায় ফুটে উঠ্‌তে থাকে।

"মানে মানে না যায়, অপমান করে' তাড়াও।" আমি বাৎলাই। আমাকে 'ছেলেমানুষ' বলার জন্যে মনিটারের ছেলেমানুষির প্রতিশোধ নিই।

মনিটার আমার দিকে কটমট করে' তাকায়।

"হ্যাঁ, আমারও সেই কথা!" সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমার কথায় সায় দ্যান্‌ঃ "সহজে না যায়, উত্তম মধ্যম দিয়ে যেমন করে পারো দূর করো! হ্যাঃ, ওদের আবার মান অপমান!"

"দেখুন সার্‌, ইঁদুরদের আমরা যতই ডিস্‌লাইক্‌ করিনে কেন, ওরা হয়তো আমাদের ততটা অপছন্দ নাও করতে পারে—এই ধরুন, যেমন ছারপোকারা—"

মনিটার ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে: "আমরা দূর করতে চাইলেও ওরা হয়তো আমাদের ছেড়ে যেতে চাইবে না। কারণ, —কারণ—"

"কারণ ওদের তো হোষ্টেলে থাকা-খাওয়ার খরচা দিতে হয় না।" কারণটা কোন্‌ একটি ছেলে ভিড়ের ভেতর থেকে বিশদ করে' দ্যায়।

"আর অখাদ্য খেয়েও ওরা টিকে থাক্‌তে পারে।" আমি বলে' উঠি! "ঠিক আমাদের মতন নয়।"

"ওসব আমি জানিনে! হয় ইঁদুরদের তাড়াও যেমন করে' পারো—নয়তো তোমার মনিটারিও গেল!"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই শব্দভেদী বাণ ছেড়ে—মনিটারের মর্ম্মভেদ করে', ছিন্নপত্র হাতে, প্রিন্সিপালের ঘরের দিকে রওনা দিলেন।—

আর আমরা সবাই খুসিতে টইটুম্বুর হয়ে উঠ্‌লাম। এই ছেলেটির মনিটারির ওপরে আমরা সবাই হাড়ে হাড়ে চটে ছিলাম। খারাপ খাওয়াতে এরকম ওস্তাদ্ আর দুটি ছিল না। অখাদ্য তবু বা কোনোরকমে সওয়া যায়, কিন্তু তার ওপরে—তারও ওপরে—বোঝার উপরন্তু শাকের আঁটিটির মতো—হোষ্টেলের ডিউ আদায় করতে যা জোর জুলুম লাগাতো তা অসহ্য। সারা মাস ধরে এক ঘ্যাঁট-চচ্চড়ির গাদা আর সারা মাস ধরে একই তাগাদা—খেয়ে খেয়ে আমরা তো অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। যাক্, ইঁদুর আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—এই দুই জবরদস্তের পাল্লায় পড়ে হতভাগা এবার খুব জব্দ হবে, ভেবে আমাদের এমন আনন্দ হোলো যে কী বল্‌ব!

অসহায় দৃষ্টিতে মনিটার একবার আমাদের সবাকার দিকে তাকালো। তারপর সকাতর কণ্ঠে বল্লেঃ "ইঁদুর তাড়াতে হলে কি কর্তে কি করে' থাকো তোমরা?"

"কিচ্ছু করি না।" আমরা একবাক্যে বলে' দিই। "তাছাড়া, সে মাথা ব্যথা তো আমাদের নয়; তোমার।"

"হুঁ, হয়েছে!—" বড়দরের আবিষ্কারকের মত মুখখানা করে মনিটার অকস্মাৎ লাফিয়ে ওঠেঃ "ইঁদুরধরা কল।

জাঁতিকল যার নাম!—তাই! তাইতো দরকার! এক্ষুনি বাজারে গিয়ে আমি কিনে আনছি গোটাকতক।"

এই বলে ভুরু কুঁচকে, আমাদের দিকে দু চোখের দারুণ বিষদৃষ্টি হেনে, হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল মনিটার।

সেই সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যের মুখে এক ঝাঁকা জাঁতিকল ঘাড়ে করে মনিটার ফিরে এল। এক আধটা নয়, আট-চল্লিশটা জাঁতিকল, কেবল বাজারে কুলোয়নি, বাড়ী বাড়ী ঘুরে যোগাড় করতে হয়েছে। ইঁদুরদের বজ্জাতির বিরুদ্ধে মনি-টারের এই বিজাতীয় অভিযান।

জাঁতিকলগুলোর মাথায় ছোট ছোট চালের পুঁটুলির নিমন্ত্রণপত্র লাগিয়ে এখানে ওখানে সেখানে—স্থানে অস্থানে চারধারে সে চারিয়ে দিল। ইঁদুরদের জন্য ওৎ পেতে রাখ্ল সব জায়গায়। এমন সব জায়গায়, যেখানে কোনো ভবঘুরে ইঁদুরও ভুলেও কখনো পা বাড়ায় না। আর পা বাড়ালেও—এই সব পাতানো সম্পর্কে—এই ধরণের ফাঁদে মাথা গলাবে কিনা আমার ঘোরতর সন্দেহ ছিল। বরং, আজকালকার চালাক্ চতুর যতো ইঁদুর—এই সেকেলে ব্যবহারে—চটে যদি নাও যায়, একটু মুচকি হেসেই চলে যাবে, এই আমার বিশ্বাস।

আমাদের মনিটার কিন্তু খুব সিরিয়স্। এই সব ক্রিয়া-কাণ্ড সেরে ইঁদুর পড়ার প্রতীক্ষায় সে উৎসুক—একাগ্র—উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগ্ল।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো না। খানিক পরেই

ধারালো একটা তার-স্বর চারিধার বিদীর্ণ করে' ফেটে পড়ল। কিন্তু, কোনো ইঁদুরের কণ্ঠনিসৃত নয়, খোদ্ আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের।

মনিটার ইঁদুর-তাড়াবার কী যেন সব করেছে তাঁর কানে গেছল, তারফলে কতগুলি ইঁদুর এতক্ষণে বিদূরিত হোলো জানবার জন্মে তাঁর তর্ সইছিল না। মনিটারের সঙ্গে সাক্ষাতের লালসায় দোতলা থেকে তিনি তর্ তর্ করে' নামছিলেন, এমন সময়ে সিঁড়ির ধাপে, লুক্কায়িত ভাবে অপেক্ষমাণ একটা জাঁতি-কলে তাঁর পা আট্কে যাওয়াতেই এই আর্ত্তনাদ! সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট-নির্গত এই তীব্র নিনাদ!

মনিটারের প্রথম শিকার—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তিন তিনটে পায়ের আঙুল!

"কী কাণ্ড! উঃ, কি কাণ্ড!"—চেঁচিয়ে হোষ্টেল ফাটিয়ে মনিটারকে সামনে পেয়ে তেলে বেগুনে তিনি জ্বলে উঠলেন: "এই তোমার ইঁদুর তাড়ানো? কী সব মারাত্মক যন্ত্র!—এক্ষুনি এইসব যন্ত্রণা এখান থেকে খেদিয়ে দাও! হোষ্টেলের কোথ্থাও যেন এসব যন্ত্রপাতি না থাকে। নইলে তোমার মনিটারি তো গেলই, তুমিও গেলে! ইঁদুর তাড়াতে না পারি, তোমাকে আমি তাড়াবো।"

জাঁতিকলটাকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পা থেকে ছাড়িয়ে এনে নিঃশব্দ অধোমুখে মনিটার যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেছল। তার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

আর সেই যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চূড়ান্ত কথাটি বলে দিয়ে আহত আঙুল তিনটি স্বহস্তে ধারণ করে'—তখনো তারা পদচ্যুত হয়নি একেবারে—ঠায় এক পায় দাঁড়িয়ে রইলেন, যতক্ষণ না মনিটার তার সমস্ত ভয়াবহ কলকৌশল কুড়িয়ে বাড়িয়ে হোষ্টেলের ত্রিসীমানার বাইরে একেবারে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করে' ফিরে এল, ততক্ষণ সিঁড়ির সেই ধাপ্‌টি থেকে আর এক পাও তিনি নড়লেন না।

জাঁতিকলরা চলে গেল কিন্তু ইঁদুরজাতি গেল না—মনিটারের মুরুব্বিগিরি এদিকে যায় যায়! কী করে বেচারী! তক্ষুনি আবার সে বাজারের দিকে রওনা দিল। সেই রাত্রেই নিয়ে এল একগাদা ইঁদুর-মারা বিষ—আর দ্বিগুণ উৎসাহে তাই সে ছড়িয়ে দিল হোষ্টেলের দিগ্বিদিকে।

"এত গন্ধ কেন?" পরদিন সকালে তদারকে এসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাই জিজ্ঞেস করলেন সবাইকে: "এমন বিচ্ছিরি গন্ধ কিসের!"

"মনিটারের গন্ধ সার্।" আমরা জানালাম।

"মনিটারের গন্ধ? তার মানে?" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারেন না। বোধ হয় তাঁর নিজের নাকের ওপরেও অবিশ্বাস জন্মে যায়।

"আজ্ঞে, মনিটারের নিজের গন্ধ না।" আমাকেই তাঁর নাসিকা-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করে' দিতে হয়: "ইঁদুর-তাড়ানোর জন্যে চার ধারে সে কী সব ছড়িয়েচে তারই সৌরভ।"

"সৌরভ! ছি—ছি—ছি!" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একবাক্যে ছি ছি করতে লাগলেন: "ভারী বিচ্ছিরি তোমাদের রুচি। নাক বলে' কিছু কি নেই তোমাদের? কোথায় গেল সে নাক-না-ওয়ালা?—"

হাঁক পড়তেই 'সে' হাজির।

"কী এসব ছড়িয়েচ? দুর্গন্ধে আমার গা বমি বমি করছে। অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে এল বলে'। এক্ষুনি এই সব গন্ধমাদন হটাও এখান থেকে।" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গলায় করাত: "আগে হটাও, তারপরে অন্যকথা।"

"কি করে' হটাবো সার্?" কাঁদো-কাঁদো হয়ে বল্ল মনিটার: "এতো জাঁতিকল না যে সরিয়ে ফেল্‌ব। ইঁদুর মারা বিষ! ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, লেপ্‌টে সেঁটে গেছে মাটিতে—এখন একে তুলি কি করে'?"

"এম্‌নি না ওঠে, না উঠ্‌তে চায় যদি—তুমি চেটে শেষ করো! অতশত আমি জানিনে!" এই বলে' চটে মটে, চাট্‌বার ব্যবস্থাপত্র দিয়ে, নাকে রুমাল চেপে চলে গেলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

যতই চাটুকারিতা থাক্‌, বিষ চেটে সাবাড় করা কোনো মনিটারের কর্ম্ম না।

জনমজুর ডাকিয়ে চারশো বাল্‌তি জল ঢেলে সমস্ত দিন হস্তদন্ত হয়ে হোষ্টেল সাফ্‌ করতে হলো মনিটারকে। এক-দিনের এই পরিশ্রমেই আধখানা হয়ে গেল বেচারা!

ইঁদুর-মারা বিষ দূরীভূত হোলো। আমরা নিশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম।

ইঁদুররা কি করে' এতক্ষণ কাটিয়েছে ওরাই জানে, কিন্তু কাল রাত থেকে রুদ্ধ নিশ্বাসে বাস করে' কী কষ্ট যে গেছে আমাদের, ভাবতেও—উঃ!

মনিটার কিন্তু বেপরোয়া। যে করেই হোক, ইঁদুর তাড়িয়ে তার মনিটারি বজায় রাখ্‌বেই—যেম্‌নি মরিয়া তেম্‌নি সে নছোড়বান্দা! তৃতীয় দিনে বাজারে গিয়ে সে একটা হুলো বেড়াল পাক্‌ড়ে নিয়ে এল। মিশ্‌মিশে কালো বেড়াল। "এইবার জব্দ হবে ইঁদুর!" মনিটারের চোখেমুখে পরিতৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়েঃ "এই বেড়ালেই ওদের জলযোগ করে' ফিনিশ্‌ করবে।"

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁদুরদের পিক্‌নিক্ করার দিকে বেড়ালটির তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। ইঁদুরের চেয়ে রান্নাঘরের মাছের দিকেই ওর বেশী আগ্রহ প্রকাশ পেল।

এমন কি, তার ফিনিশিং টাচ্‌ দিতেও সে দ্বিধা করল না। খোদ্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পাত থেকেই মাছের মুড়োটা থাবা মেরে তুলে নিয়ে সট্‌কান্ দিল একদিন!—

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কঠোর মন্তব্যে মনিটারের কুরুচির প্রতি ক্রূর কটাক্ষ করলেন—ধেড়ে ছেলের বেড়াল পোষবার সখ ছ্যাখো! এসব মামার বাড়ীর আব্‌দার এখানে শোভা পায় না, স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দিলেন। এবং বেড়ালটার প্রতি

কেবলমাত্র কটাক্ষ করলেন, তার বেশী আর কিছু করলেন না। করবার ছিলও না কিছু, কেননা, নাগালের বাইরে গিয়েই মুড়োটাকে গালের ভেতরে বাগাবার চেষ্টায় সে ব্যস্ত ছিল তখন!

কিন্তু যেদিন রাত্রে অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে বেড়ালটার তিনি ল্যাজ মাড়িয়ে দিলেন আর বেড়ালটা খ্যাঁক্ করে' তাঁকে আঁচড়ে কাম্ড়ে একশা করল সেদিন আর রক্ষা থাক্ল না!

সারা হোষ্টেলময় সমস্ত রাত তিনি দাপাদাপি করে' বেড়ালেন!—"কী সর্ব্বনাশ, ছ্যাখো দিকি! বেড়ালে কাম্ড়ালে কী হয় কে জানে! কুকুরে কাম্ড়ালে তো জলাতঙ্ক হয়, ইঁদুরে কাম্ড়ালে র‍্যাট ফিভার হয়ে যায়—এখন বেড়ালের কামড়ের ফলে—কী জানি কী যে হবে!—" এই কামড় কতদূর যে গড়াতে পারে ভেবে ভেবে তিনি আকুল হয়ে ওঠেন।

"হয়তো স্থলাতঙ্ক হতে পারে।" ওরকম ব্যাকুলতা দেখে, তাঁর দুর্ভাবনা দূর করার মানসেই সান্ত্বনাচ্ছলে আমি বলি।—"তার বেশী কিছু হবে না সার্।"

"য়্যাঁ? কি বল্লে? স্থলাতঙ্ক? তাহলেই তো গেছি! বেড়াল কামড়ানোয় স্থলাতঙ্ক হয় না কি? কী সর্ব্বনাশ! তাহলে কোন্ স্থলে গিয়ে বাঁচবো? এবার আমি মরলুম—সত্যিই মারা গেলুম এবার। এতদিন বেঁচে থেকে আর বাঁচা গেল না। এই মনিটারটি আমায় মারল। ওর বোকামির জন্যেই এইভাবে বেঘোরে আমায় মরতে হোলো!"

মনিটার যতই তাঁকে বোঝায় বেড়ালে কাম্‌ড়ালে কিস্‌সু হয় না, সমস্ত কেবল আমার চালাকি, ততই তিনি আরো ক্ষেপে ওঠেন :

"হ্যাঁ, কিস্‌সু হয় না! হয় না! তোমার মাথা! তুমি জানো! তুমি জানো সব! ফের যদি তোমার ঐ ইষ্টুপিট বেড়ালকে এই হোষ্টেলে দেখি তাহলে দেখে নেব! এতই যদি তোমার বেড়াল পোষার বাতিক, নিজের বাড়ী নিয়ে গিয়ে সখ মেটাও না বাপু!"

এ পর্য্যন্ত মনিটার কোনো রকমে সয়েছিল—এত লাঞ্ছনাতেও কিছু বলে নি, কিন্তু নিজের সখের খাতিরে ওর বেড়াল পোষার বাতিক এই অভিযোগে এমন ও শক্‌ পেল যে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেল। আর সহ্য করতে না পেরে, এক পদাঘাতে, সাম্‌নের মুক্ত দ্বারপথে বেড়ালটাকে বিবাগী করে' দিল। টি-এম্‌-ও করে' দিল তৎক্ষণাৎ।

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, পেছনের দরজা দিয়ে ফিরে এল বেড়ালটা!

মনিটার এবার ওকে করায়ত্ত করে' ক্রিকেটবলের মতো হাঁক্‌ড়ে ফের আবার বার করে' দিল।

এবং পুনরায় সে ঘুরে এল—এবার এল জানালা দিয়ে।

মনিটার তার দিকে তাক্‌ করে' বই খাতা ছুঁড়ে লাগায় আর সেও যার পা সাম্‌নে পায় আঁচড়ে কাম্‌ড়ে তার শোধ তোলে। এইভাবে সে একবারে খোদ্‌ প্রিন্সিপালের পা সম্মুখে

পেয়ে গেল—এমন হৈ-চৈ-কাণ্ডটা কিসের এই খোঁজ নিতেই আসছিলেন—এখন নিজের পায়েই তার পরিচয় পেয়ে, লেটেস্‌ট নিউজ্‌ বহন করে' বিরক্ত হয়ে তিনি চলে গেলেন। যাবার সময়ে শাসিয়ে গেলেন, কাল্‌কেই তিনি রাষ্টিকেট করে' ছাড়বেন।

তারপর সত্যিই যেন স্থলাতঙ্ক বেধে গেল! বেড়ালতো ক্ষেপে ছিলই, মনিটারও ক্ষেপে গেল যেন! প্রিন্সিপাল পরিষ্কার করে' না বলে' গেলেও, বেড়াল যে নয়, ওর বরাতেই যে উক্ত রাজটীকা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, কেমন করে' যেন ওর ধারণা হয়ে গেছল। চেঁচিয়ে মেচিয়ে তুল্‌তামাল্‌ করে' তীরবেগে বেরিয়ে গেল মনিটার।

তারপর, বহুক্ষণ বাদে, টল্‌তে টল্‌তে, কোথ্‌থেকে এক খেঁকি কুকুর নিয়ে এসে সে হাজির হোলো।

"কই, কোথায় গেল সেই অপয়া হতচ্ছাড়া?" এসেই, চোখ মুখ পাকিয়ে, চারধারে সে বেড়ালের খোঁজ করতে থাগল।

তারপর থেকে ঘটনার গতি দ্রুতবেগে ধাবিত হোলো। এবং বেড়ালটাও। কুকুরের আভাস দেখবামাত্রই সে উধাও হয়েছিল। আর বেড়ালের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পলকের মধ্যে, ইঁদুররা সদল-বলে ফিরে এল আবার। প্রকাশ্যভাবেই তারা পায়চারি করতে আরম্ভ কর্‌ল—কুকুরটার চোখের সামনেই অসঙ্কোচে এধারে ওধারে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল।

এবং সেই খেঁকি কুকুরটা ইতিমধ্যে আর কোনো কাজ না পেয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অন্য পায়ে কাম্‌ড়ে দিয়েছে, খাবার ঘরের বাসনপত্র ভেঙে চুরে তছনছ করে' একাকার করেছে আর রান্নাঘরের অধিষ্ঠাতা দেবতা উড়ে ঠাকুরকে (কুকুরের ধমক্ শোনবামাত্রই তো সে উড়ে দৌড় !) পেয়ারা গাছের মগডালে তুলে রেখে এসেছে।

এবং দুর্ঘটনার ওপর দুর্ঘটনা ! সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিপদের বার্ত্তা পেয়ে,—বেড়ালের কামড়ের পরে কুকুরের কাম্‌ড়ানির কথা তাঁর কানে যেতেই—স্বয়ং প্রিন্সিপাল, মনিটারকে পরদিবসে রাষ্টিকেট করবার কর্ত্তব্য আপাতত মুল্‌তুবি রেখে, চাক্‌রিতে ইস্তফা দিয়ে তল্‌পি তল্‌পা গুটিয়ে সেই দণ্ডেই সরে পড়েছেন শোনা গেল।

আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও, এক পায়ে বেড়ালের, অন্য পায়ে কুকুরের দংশন-চিহ্ন ধারণ করে', অনন্যোপায় হয়ে প্রিন্সিপালের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন কি না স্থির করতে লাগলেন। তাঁর পোঁটলা পুঁটলি বাঁধতেই যা বাকী ! আর মনিটার ? তার কোনো পাত্তা নেই। খুব সম্ভব, কুকুরকে নিষ্কাশিত করার মৎলবে, হাতীঘোড়া একটা কিনে আনবার জন্যেই সে বাজারের দিকে ধাওয়া করেছে এবার। অন্ততঃ, আমার তো তাই ধারণা !

আমরা বিছানার ওপর টেবিল চাপিয়ে যে যার ছোট্ট টেবিলের ওপরে কম্পান্বিত কলেবরে দাঁড়িয়ে আছি !

এদিকে ইঁদুররাও সগৌরবে আনাচে কানাচে সর্ব্বত্র ফের ঘুর্ ঘুর করতে সুরু করেচে ! কোনো দিকে তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

আর এধারে কুকুরের লম্ফ ঝম্প দ্যাখে কে !



আমার বইয়ের কাটতি!

(কিম্বা কাট্-তিও বলা যায়)

আমার পাশের চেয়ারের লোকটি যে ত্রিভঙ্গিম, টের পেলাম অনেক পরে। কি করে' আন্দাজ করবো বলো? ত্রিভঙ্গিমের এ-ভঙ্গিমা কখনো দেখিনি, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি কোনোদিন। ত্রিভঙ্গিম হেয়ার্ কাটিং সেলুনে বসে' নিজের পয়সা খসিয়ে এত ঘটা করে' চুল ছাঁটাবে—একথা ধারণা করতেই মাথা ঘুরে যায়।

কিন্তু সত্যিই তাই! এতক্ষণ ধরে' আমারই পাশের চেয়ার দখল করে' চুল ছাঁটানো, দাড়ি কামানো, নোখ চাঁছানো থেকে সুরু করে' মাথায় দলাই-মলাই, শ্যাম্পু এবং হেয়ার ড্রেসিং—মায় মুখে পাউডার মাখানো পর্য্যন্ত একটার পর একটা অবাধে বিনা প্রতিবাদে যিনি করিয়ে নিচ্ছিলেন তিনিই আমাদের ত্রিভঙ্গিম। নিজের চুলক্ষয়ে—নিজের মাথার উপরে কাঁচির খচ্‌খচানি শুনে তন্ময় হয়েছিলাম তাই এতক্ষণ ওকে লক্ষ্য করিনি—এখন লক্ষ্য করে' মাথা ঘুরে গেল।

দুজনে এক সঙ্গেই সেলুন্ থেকে বেরুলুম। বেরিয়েই, সাম্‌নে চায়ের দোকান দেখে, ত্রিভঙ্গিম বল্ল: "একটু চা খাওয়া যাক্—এসো!"

আমার চমক্ লাগ্‌ল। য়্যাঁ? এ কি? বলে কী ত্রিভঙ্গিম?

চা-খানায় বস্‌তে না বস্‌তেই ত্রিভঙ্গিম বলে: "আর, কী খাবে বলো? ওম্‌লেট? পোচ? টোস্‌ট্? কিচ্ছু খাবে না? আমার পয়সা কিন্তু?"

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় আমায় মুহ্যমান করে' দেয়। এই সুবিন্যস্ত কেশ, মুক্তহস্ত, বন্ধুবৎসল ত্রিভঙ্গিম আমার একেবারে অজ্ঞাত। যে ত্রিভঙ্গিমকে আমি চিনি, হাড়ে হাড়েই চিনি—ইনি ত তিনি নন্! ওর শরীর সুস্থ আছে কি না, সুকৌশলে জান্‌তে চেষ্টা করলাম। শরীরের কথাটা জেনে নিয়ে তারপরে ওর মাথার ঠিক আছে কি না জানতে চাইব।

"শরীর? শরীর আমার ভীষণ ভালো যাচ্ছে আজকাল। বিশেষ করে' কবিরাজ হারাণ সেনের চার বোতল সেই দ্রাক্ষারিষ্ট খাবার পর থেকে—পার্ বোতল দেড় টাকা—এমন তোফা রয়েছি এখন—যে কী বল্‌ব!"

"জলের মতো টাকা ওড়াচ্ছ বলে' আমার বোধ হচ্ছে।" আমি বল্লুম।

"টাকা নয়, বই।" বল্ল ত্রিভঙ্গিম। "তোমারই বই। তোমার সেই গল্পের বইটা—ওই যে—কী—কথা বলার বিপদ—না—কি!"

"আমার সদ্যপ্রকাশিত বইটা? প্রকাশকের দেয়া তার কপিগুলো কি তোমার বাসাতেই ফেলে এসেছিলাম নাকি? য়্যাঁ? তাই নাকি?" আমি চীৎকার করে' বলে' উঠি: "কোথায় যে ফেল্লাম কপিগুলো ভেবে ভেবে এদিকে আমি কাহিল হচ্ছি!"

"পঁচিশখানা কপি তো মোটে: মোট্‌মাট্ পঁচিশটিমাত্র—আমি বেশ করে' গুণে দেখেছি।"

"কপিগুলো কি তুমি বেচে দিয়েছো নাকি ?" আমার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস।

"হায়, সেই চেষ্টাই করেছিলাম প্রথমে।" দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বল্লে ত্রিভঙ্গিম ঃ "ভেবেছিলাম অসংখ্য বন্ধু আমার। পঁচিশটা কপিই তো ! এ-কটা পাচার্ করে' দিতে আমার কতক্ষণ ! আর তুমি যখন ভুলে ফেলেই গেছ, তোমাকে ফের মনে করিয়ে দিয়ে অনর্থক কেন কষ্ট দেওয়া ?—মনঃ-পীড়া দেওয়া বইতো না ?—"

"বেচে দিয়েছ—স—ব ?" আমি বাধা দিয়ে জান্‌তে চাই।

"বেচ্‌তে আর কই পার্‌লাম ! কেউ কিন্‌লে তো ! শুনেছিলাম তোমার বইয়ের নাকি খুব কাট্‌তি !···তোমার মুখেই শুনেছিলাম।···ভুলিয়ে ভালিয়ে ভুজুং দিয়ে আমাকে তোমার প্রকাশক করবার তালে ছিলে কিনা খোদাই জানেন ! কিন্তু বল্‌ব কি, তোমার বই কাটাতে গিয়ে আমার অনেক বন্ধু কেটে গেল—বিস্তর—বিস্তর বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়ে গেল।"

"বলো কি !" ওর বন্ধু-পাতের কথা শুনে আমার বই-লোপাটের কথাও ভুলে যাই।

"ডজন ডজন বন্ধু ছিল আমার, বন্ধু হে ! কিন্তু তারা কী পরিমাণ বন্ধু, বই বেচ্‌তে গিয়েই টের পেয়েছি। পাঁচ সিকেও দাম নয় কারো বন্ধুত্বের ! নগদ মূল্যে দুখানা কেবল বেচ্‌তে পেরেছি ভায়া—পাঁচ সিকে করে' আড়াই টাকা পেয়েচি মবলগ্‌। তারপর ভাব্‌লাম বার্টার্‌-সীস্‌টেম্‌ করে'

দেখ্‌লে কেমন হয়—মালের বদলে মাল। আমার প্রথম বধ্য হচ্ছে এই চা-খানার মালিক—অদ্য যেখানে বসে' চা পান করছি আমরা। কী, আরেক কাপ্‌ চা চাই নাকি?"

"না, থাক্।" কষ্টে-সৃষ্টে আমি জানাই: "ধন্যবাদ!"

"প্রথমে লোকটা রাজি হতে চায়নি। বই নিতে রাজি হয়নি গোড়ায়। বলেছিল, তার চা যে সুখাদ্য এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ, কিন্তু বইটা ততখানি সুখাদ্য কিনা সে বিষয়ে তার সন্দেহ আছে।...কী! আমার বন্ধুর বইকে অখাদ্য বলা! রাগ হয়ে গেল আমার। তক্ষুনি আমি স্পষ্টাস্পষ্টি তাকে জানিয়ে দিলাম, তাহলে আজ থেকে আমার—আমারও এই দোকানে ইস্তফা! কাল থেকে ঐ সাম্‌নের চা-খানাতেই চা খাবো! এবং বন্ধু-বান্ধবদের চাখাবো! এইভাবে হুম্‌কি দেওয়ার ফলে চায়ের বদ্‌লি একখানা বই ও নিয়েছে—নিতে বাধ্য হয়েছে।"

এই পর্য্যন্ত বলে' ত্রিভঙ্গিম দোকানের এক কোণে কোন্‌ঠাসা চায়ের মালিকের দিকে আড়চোখে তাকায়।

আমিও ওর প্রথম নিহতটির দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হই।

সেই দুর্ব্বাধ্য লোকটি তার ছোট্ট টেবিলের উপরে দুর্ব্বোধ্য বইটির দিকে ম্রিয়মান হয়ে তাকিয়ে আছে দেখতে পাই।

"চায়ের বদলে বই—বদ্‌লাবদ্‌লি সীস্‌টেমে। বইয়ের বদলে চা। এ পর্য্যন্ত আমি এই ক'দিন ধরে' তোমার বইটার পাঁচটা গল্প পর্য্যন্ত পান করতে পেরেছি,—তোমাকে আমাকে

দুজনকে জড়িয়ে এই এখন অবধি বইটার সাড়ে সাত আনা উঠ্‌লো—” ত্রিভঙ্গিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেঃ “আরো—এখনো সাড়ে বারো আনা বাকী !……দেবে আরেক কাপ্‌ ?”

“তোমার হেয়ার্ কাটিং সেলুনের অত সমারোহ যে কেন তাও আমার কাছে বেশ পরিস্ফুট হচ্ছে এখন।” আমি বলি।

“হ্যাঁ, তাইই। ঠিকই ধরেচ। কিন্তু সেলুনের লোকটা এ-লোকটার চেয়েও বেশি আনাড়ি। কথা বলার বিপদ—নামটা দেখেই বল্লে, এ বই তার কোনো কাজে লাগবে না। চুল ছেঁটেই ওদের ফুর্‌সৎ নেই, কথা কইবে কখন ? কথা বল্লে তো বিপদ ! এ-বইয়ের মধ্যে ওর শেখবার কী আছে জান্‌তে চাইল। কী করি ? বল্লাম যে, মেয়েদের বব্‌ছাঁট্‌ ছেলেদের ঘাড়ে চাপানোর কৌশল এতে বিশদরূপে বিবৃত করা রয়েছে। এই বলে'—অনেক বলে' কয়ে তো খান্ দুই ওকে গছিয়েছি। ও কিন্তু এই সর্ত্তে রাজি হয়েছিল যে বইয়ের বদ্‌লি আড়াই টাকা দামের চুল ছাঁটাই দাড়ি কামাই শ্যাম্পু ইত্যাদি সব আমায় এক চোটে তুলে নিতে হবে। রোজ রোজ খুচ্‌খাচ্‌ চল্‌বে না ! কি করি বলো—এক নাগাড়ে বসে' তিন বার চুল ছাঁটালুম, পাঁচবার হেয়ার ড্রেসিং করে' দিলে, সাত বার দাড়িকামাতে হোলো। নোখ্‌ কাটাই হোলো বার দশেক। সেই সকাল থেকেই চলেছে ! উঃ ! যা জ্বল্‌ছে সারা মুখ। তেমনি আবার নোখের ডগা গুলো !”

সান্ত্বনাচ্ছলে ওর গালে হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছা করল—

সাতবার কামানো হলে মসৃণতা কেমন হয় জানবার কৌতূহলও যে একটু না জাগল তা নয়,—কিন্তু আমার যতো বিপদ উদ্ধার করেই যে ওর এই দাড়িশূণ্যতার বিলাসিতা একথা ভাবতেই ওর প্রতি হস্তক্ষেপ করবার উৎসাহ আমার লোপ পায়।

হাতের সঙ্গে গালের প্রায় এক ইঞ্চির সমান্তরাল রেখে, ও নিজেই নিজের সারা মুখে হাত বুলাতে থাকে। এবং সেই হাত বুলোনোতেই সুকর্তিত নোখের মুখে এমন আঘাত লাগে যে পুনঃ পুনঃ ফুঁ দিতে হয়। তারপর ক্ষুরের মতো ধারালো এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে' ও বলে: 'উঃ! পরের বই কাটানো যে কী ঝকমারি! আর কেউ যেন কখনো এমন কাজ না করে। এর চেয়ে বই দুটোর পেজ্ বাই পেজ দিনের পর দিন দেড় বছর ধরে বাড়ী বসে দাড়ি কামিয়ে কাটাতে পারলেও আমার কোনো ক্ষতি ছিল না।···উঃ।"

"এইভাবে আর কতোগুলি কপির হাত থেকে তুমি রেহাই পেয়েছ?" আমি জিজ্ঞেস করি: "কতোগুলি বইকে মুক্তি-দান করেছ আমার?"

"ওষুধের দোকান বোস্ কোম্পানিতে চেষ্টা করেছিলাম। খান্ চারেক বইয়ের বিনিময়ে পাঁচ টাকা দামের টুথ্পেস্ট, হেয়ার ক্রিম্, ওভ্যাল্টিন্ আর লিলিবিস্কুট এই সব পাওয়া যায় কি না—খোজ করেছিলাম। তাঁদের মুখে আশ্চর্য্য এক বিস্ময়ের চিহ্ন দেখ্লাম—এবং চিহ্নটি কেবল চিহ্নমাত্র না থেকে নৈঋৎ কোণের মেঘের মত ক্রমশই এত বর্দ্ধিত হতে লাগল যে

জবাব জান্‌বার জন্যে বেশিক্ষণ আমার দাঁড়াবার সাহস হোলো না। নিশ্চিহ্ন হবার ভয়ে পালিয়ে এসেছি তৎক্ষণাৎ!"

"ভালোই করেছ। বটকেষ্ট পালে একবার ঢুঁ মার্‌লে না কেন? তাদের দোকান তো আরো বড়ো?"

"নাঃ, ঢুঁ মেরে ফল নেই। ফয়দা নেই দাদা—আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ-ওলারা কোনো কাজের নয়। আমাদের কবিরাজরা ওদের চেয়ে ঢের ভালো। ঢের বিচক্ষণ! এই জন্যেই অনেকে কবিরাজির পক্ষপাতী। এমন কি আমাকেও হতে হয়েছে। চারটে কপির বদলে কবিরাজ হারাণ সেন বড় বড় চার বোতল দ্রাক্ষারিষ্ট দিয়েছেন। চার চার বোতল! হাতে হাতে! তাও আবার হাফ্‌ প্রাইসে—মুক্ত হস্তেই দিয়ে দিলেন। কথা পাড়বা মাত্রই যেন লুফে নিলেন বই কখানা! কবিরাজ অথচ সাহিত্যরসিক, এমনটি এর আগে আমি আর দেখিনি! বল্লেন, কাগজ যা আক্রা আজকাল, আর, এমন ভালো কাগজে ছেপেচে! আবার ছবিও আছে দেখ্‌চি! বাঃ! তারপর—" ত্রিভঙ্গিম থেমে যায়: "তারপর আর যা বল্লেন, বলব?"

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাই—আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না।

"বল্লেন, ওষুধের পুরিয়া বাঁধবার খাসা মোড়ক হবে।" বল্ল ত্রিভঙ্গিম: "যথার্থই লোকটা সাহিত্য-রসিক। আমার শ্রদ্ধা হচ্চে।"

কবিরাজ হারাণ চন্দ্র সেন ভিষগ্‌রত্নের সাহিত্য-রসিকতা

নিয়ে আমি মনে মনে একটু নাড়াচাড়া করি, তারপর ভগ্নকণ্ঠে বলি ঃ "মোট্‌মাট্‌ কখানা কাটিয়েছ এই করে'? নগদ মূল্যে তো দুখানা,—চায়ের বদলি এক,—চুল ছাঁট্‌তে দুই,—আর কবিরাজখানায় চার—সবশুদ্ধ নখানা গেল ? তাই না ?"

"নখানা ? নখানা মোটে ? সব কখানাই গেছে। কিন্তু যাওয়াতে যা বেগ পেতে হয়েছে আমাকে—যা করে' যাইয়েছি—তা কেবল এক খোদাই জানেন।" ত্রিভঙ্গিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ল, "আর—আর আমিও জানি কিছু কিছু !"

"একখানাও আর বাকী নেই ?" আমার ভগ্নতর কণ্ঠ থেকে বেরয়।

"আর একখানাই কেবল বাকী আছে।" এই বলে' ত্রিভঙ্গিম পকেট থেকে—পঁচিশ খানার ধ্বংসাবশেষ—সেই একমাত্র কপিটিকে টেনে বার কর্‌ল ঃ "এইটাই কেবল কাটাতে বাকী !"

"এটা নিয়ে কোথাও চেষ্টা করো নি ?" আমার গদ্‌গদ গলা থেকে বার হয়।

"করিনি আবার ? কমলালয়ের রিডাক্‌শন্‌ সেলে কপাল ঠুকে ঢুকেছিলাম—এর বদলে একখানা রুমালও পাওয়া যায় যদি। তাঁরা বল্লেন, রিডাক্‌শন্‌ সেল্‌ বটে, মালপত্রের দামও খুব কমানো হয়েছে সেকথাও সত্যি—কিন্তু তা বলে' অতোদূর কমানো হয়নি। খুব কঠোর ভাষাতেই তাঁরা এই কথা বল্লেন। আমি বল্লাম, খদ্দেরদের সঙ্গে তাঁদের যদি এই ধরণের ব্যাভার

হয়, তাহলে তাঁদের দোকানে এই আমার শেষ পদার্পণ! তাঁরা জানালেন, 'আমার মতো বহুমূল্য খদ্দের হারাণো খুবই দুঃখের কথা নিঃসন্দেহ, কিন্তু কি করবেন, তাঁরা নাচার—এত বড় দুঃখও তাঁদের বুক পেতে সইতে হবে। উপায় কি?' এই না শুনে আমি তৎক্ষণাৎ বই নিয়ে চলে এসেছি।"

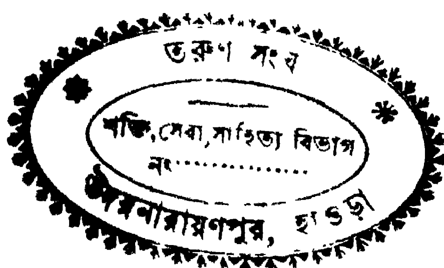
'আমার মনে হয় মেছোবাজারে মেছুনীদের কাছে একবার চেষ্টা কর্‌লে পারতে।"

"তা কি আর করা হয়নি? বইয়ের কথা শুন্‌তেই তারা রাজি নয়। আলুপটল-ওলাদেরও বাজিয়ে দেখেছি! কিন্তু সব বৃথা! মাংসওলাকেও বলা হয়েছিল—কাটারি নিয়ে মার্‌তে আসে আর কি! এখন শুধু শ্রীমাণী মার্কেটের মশ্‌লাওলারা বাকী আছে কেবল। চলোনা একবার চেষ্টা করে' দেখি গে।"

ওই ভেতরে যায় বই নিয়ে—আমি বাজারের গেটে—গেটের বাইরেই দাঁড়াই। হাতাহাতিতে যোগ দেয়া তো দূরে, মারামারির সাক্ষী হবারও আমার সামর্থ্য নেই। কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হয় না, একটু পরেই ও ম্লান মুখে বেরিয়ে আসে।

"উঁহু, হোলোনা। বইটার বদলে, পাঁচ সিকে তো পরের কথা—বারো আনা—ছ আনা—এমন কি দু আনা দামেরও লবঙ্গ এলাচ তেজপাতা ইত্যাদি দিতে প্রস্তুত নয়। উল্‌টে যা তেজ দেখাচ্চে—বাপ্‌! কেবল একজন লোক একটু আশা দিয়েছে। গেটের মুখে যে লোকটা মাখন বিক্রি করে—সে-ই!

সে বলেছে মাস কয়েক পরে আস্‌তে—ততদিনে মাখন পচলে, পচা মাখনের বদলে হয়ত নিতে পারে। য়্যাঁ, কি বল্‌ছ? কয়েক মাস পরে কেন? ও!—ইতিমধ্যে ওর পুত্র-রত্নলাভের সম্ভাবনা আছে কি না! ছেলের দুধ গরমের জন্যেই নেবে তখন। হ্যাঃ, তার জন্যে আমি তদ্দিন বসে থাক্‌ব না-কি! আবদার দেখনা! তার চেয়ে উইয়ের হাতেই কাট্‌তির ভার দেব নাহয়। তাতেও আমার লোকসান্‌ নেই!"





পাকপ্রণালীর বিপাক!

"তুমি রাঁধতে জানো দাদা?" সকলে চা খাবার সময়ে বিনি জিগ্যেস করল।

"রাঁধতে জানিনে? কী বলিস!" সগর্ব্বে আমি বলি : "এক্ষুনি একটা ডিম সেদ্ধ করে' তোকে দেখিয়ে দেব?"

"ডিম তো নিজগুণেই সেদ্ধ হয়, তার মধ্যে আবার দেখাবার কী আছে? ওটা কি একটা রান্না?"

"হংসডিম্ব আর পরমহংসরা অন্যের অনায়াসে স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে থাকেন, মানি একথা, কিন্তু তা বলে' ষ্টোভ ধরাতে হয় না? স্পিরিট যোগাড় করতে হয় না বুঝি? তাছাড়া, আরো কতো ইত্যাদির যোগাযোগ নেই?" খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এসবের কথাও ওকে জানাতে হয়।

"তবে আর কি, তাহলে তুমি পারবে। রান্না কিছু না, তার যোগাড়যন্ত্রটাই আসল, তাই যখন তুমি পারো, তখন উনুনে কড়া চাপিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করার যন্ত্রণা তা আর তোমার পক্ষে এমন কি!"

"কেন, এসব কথা কেন হঠাৎ?" আমাকে সন্দিগ্ধ হতে হয়।

"মামার বড্ড অসুখ, ভাবচি একবার মামার বাড়ী যাব। এই দিন দশ বারোর জন্যই। সেবা-শুশ্রূষার হাঙ্গাম্—মামীমা পেরে উঠচেন না একলা।"

"মামাকে দেখতে যাবে? আর এধারে আমাকে কে ছ্যাখে?"

"আয়না রইলো। নিজেই দিন কতক নিজেকে একটু দেখলে না হয়।" বিনি হাসে। "ভাঁড়ার ঘরে চাল ডাল নুন লঙ্কা পেঁয়াজ আটা ঘি ময়দা গুঁড়ো মশলা—চিনি বাদে—আর সবই মজুদ রইলো। কোন্‌টা কি চিনতে পারবে নিশ্চয়। তাছাড়া একখানা পাকপ্রণালীও কিনে রেখে গেলাম। ইচ্ছে মত পাকাবে, খাবে।"

"কী সর্ব্বনাশ!" পাকানোর কথায় আমি ককিয়ে উঠি।

"সর্ব্বনাশটা কি? মরুভূমিতে পড়োনি যে হাহাকার করছ। দশ বারো দিন নিজেকে নাইয়ে খাইয়ে টিকিয়ে রাখতে পারবে না? কিসের মানুষ তবে? রবিন্‌সন্‌ ক্রুসোর মতন যদি বিজন দ্বীপে একলাটি গিয়ে পড়তে হতো কী করতে?"

কাঁদতাম, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতাম।" একটা সত্যি কথা বলে ফেলি।

অনেক বল্লাম, অনেক করে' বোঝালাম. অনেক অনেক কাকুতি-মিনতি করলাম, দীর্ঘ দশ বারো দিনের জন্যে একটি অসহায় অনাথ বালককে এভাবে একলা পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া তার উচিত হচ্ছে না, হয়তো আমিও এক অসুখে পড়তে পারি—মামার চেয়েও ঢের শক্ত অসুখে,—নানাদিক থেকে নানারকমে ওর প্রাণে সমবেদনা জাগানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো ফল হোলো না। বিনি চলে গেল।

লেখকদেরও পৌরুষ বলে' একটা জিনিষ থাকে। ঢের

পাওয়া না গেলেও থাক্তে পারে। এবং অনেক সময়ে গিয়েও যায় না। রবিন্‌সন্‌ ক্রুসোর মত মহাপুরুষ না হলেও, আপাত-দৃষ্টিতে তারা যতই অপদার্থ মনে হোক্‌, কোনো কোনো লেখকের মধ্যে, লেখা ছাড়াও অন্যান্য সদ্‌গুণের এক-আধটু ছিটে ফোঁটা থাকা সম্ভব। এই যেমন আমি। আমার নিজের মধ্যে পৌরুষের কোনো সম্ভাবনা কখনই আমি সন্দেহ করিনি, কিন্তু দেখলাম আছে। দেখা গেল, মরিয়া হয়ে উঠলে আমি রাঁধতেও পারি। এবং রাঁধতামও, শেষ পর্যন্ত; যদি না মাঝখানে ঐ আছাড়টা আমাকে খেতে হোতো।

বিনির অন্তর্দ্ধানের পরদিন সকালে বিছানা থেকে উঠেই চমৎকার করে' এক কাপ চা বানিয়েছি। একজোড়া ডিম সেদ্ধ করতেও দ্বিধা করিনি। অবশেষে সডিম্ব সেই চায়ের পাত্র বিছানায় নিয়ে এসে আরাম করে' খেয়ে আবার এক ঘুম লাগিয়েছি। হজম করতে হলে ঘুমোনো দরকার। উত্তম-রূপে পরিপাকের জন্য উত্তমরূপ নিদ্রার প্রয়োজন। আর আমার মতে, ঘুমোনোর জন্যেই আমাদের খাওয়া। খালিপেটে থাকলে খিদে পায়, আর খিদে পেলে ঘুম পায়না বলেই নেহাৎ কষ্ট করে' আমাদের দুবেলা কি তিনবেলা কিম্বা চারবেলা খেতে হয়। তাই না?

তারপর এগারোটার পর ঘুম থেকে উঠে পাকপ্রণালীটা হাতে করেছি। ষ্টোভটা পায়ের কাছেই রয়েছে—ধরাতে যা দেরি। পাকপ্রণালীটার পাতা ওল্‌টাচ্ছি, আজ আর বেশি

কিছু না, বিশেষ কিছু নয়, সবচেয়ে সোজা রান্না একখানা রেঁধে সোজা-সুজি খেয়ে সহজভাবে শুয়ে পড়ব। তারপর ওবেলা রেস্তরাঁ দেখলেই হবে। তারপর—কালকের কথা আবার কাল। এই ক'রে এই দশ বারোটা দিন তো তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারব। বিনিকে আমি দেখিয়ে দিতে চাই। চাই কি, নিজেকেও একহাত দেখাতে পারি—চটেমটে হয়ত পোলাও কালিয়াও রেঁধে ফেল্‌তে পারি—এর মধ্যেই একদিন কিছু আশ্চর্য্য নয়।

'পেঁয়াজের সুপ্‌ রান্নার সহজ প্রণালীটাই' সবচেয়ে আমার লাগসই লাগল। পেঁয়াজের সুপ সাহেবি রেঁস্তরায় বহুৎ খেয়েছি—চমৎকার লাগে। তাই না হয় বানিয়ে খাওয়া যাক আজকে। খেতেও ভালো, রাঁধতেও শক্ত না—যেমন পুষ্টিকর তেমনি উপাদেয়।

বইটায় দেখলাম, পেঁয়াজের সুপকে নামমাত্র খরচায় অল্প পরিশ্রমে প্রস্তুত বিলাসিতার চূড়ান্ত বলে' বর্ণনা করা হয়েছে। আমি বিলাসিতার পক্ষপাতী নই, তবু বাধ্য হয়ে আজ একটু বিলাসিতাই করতে হবে, কি করা যাবে? আর এই বিলাসিতা সমস্তটা একলাই উপভোগ করতে হবে আমায়, উপায় নেই। আমার রান্নার সৌরভ যে কতদূর যাবে জানিনে, তবু কোনো বন্ধু যে গন্ধ পেয়ে আমার পেঁয়াজের ঝোলে ভাগ বসাতে আসবেন তা মনে হয় না। সমস্ত সুরুয়াটা এক এক চুমুকে চেখে চেখে আর তারিয়ে তারিয়ে—একটুও তাড়াতাড়ি না

করে'—সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত—সুরুৎ সুরুৎ আওয়াজে একাই আমি আত্মসাৎ করতে পাবো। কেউ বাগড়া দেবার বখরা নেবার নেই। আ—হ্।

পাকপ্রণালীর নিয়মাবলী অনুসরণে লাগা গেল। ষ্টোভ্‌টা ধরিয়েছি এবং বিছানা থেকে বেশ দূরে সরিয়ে এনেছি—পাছে বিছানাটিছানা ওর অনুকরণে ধরে যায়। আগুনরা ভারী সংক্রামক। সাবধানতা ভালো।

"প্যানে আন্দাজমতো জল দাও"—বলেছে পাক প্রণালী।

আন্দাজমতো জল দিলাম—যতদূর আন্দাজ করতে পারা গেল।

"জল ফুটতে থাকুক।" থাকুক আমার কোন আপত্তি নেই।

"আধসেরটাক পেঁয়াজ কুঁচিয়ে ফ্যালো। একেবারে কুচি কুচি করে'।"

তথাস্তু। কিন্তু এইটেই এর মধ্যে সবচেয়ে শ্রমসাপেক্ষ দেখা যাচ্ছে। এবং একটু বিপজ্জনকও বই কি। পেঁয়াজের সঙ্গে নিজের কড়ে আঙুলটাও প্রায় কুঁচিয়ে ফেলেছিলাম একটু হলে! আর পেঁয়াজ কুঁচাতে বসলে, কেন জানিনা, ভারী কান্না পায়। আজই প্রথম এটা দেখতে পাচ্ছি—এমনকি, চোখের জলে ভালো দেখতেই পাচ্ছিনে। কোথ্‌থেকে চোখে এত জল আসে আর এমন চোখ জ্বালা করে! যাঁরা মারা গেছেন, মারা, দিদিমারা,—দিদিমার মা আর মার দিদিমারা সব একে একে স্মরণ পথে আসতে থাকেন। ভারী কান্না পায়, আরো

চোখ জ্বলে, এবং আরো কান্না হাউ হাউ করে' ঠেলে আসে সেই শোকের উজান ঠেলে অবশেষে দিদিমার দিদিমারা পর্য্যন্ত ভেসে আসেন। কান্না আর থামে না। গাল বেয়ে, গলা জড়িয়ে দরবিগলিত ধারে বুক ভাসিয়ে দেয়। কান্নার আবেগে আরো কাঁদি। অকারণে কাঁদি। অশ্রুপ্লুত হয়ে পেঁয়াজ কুচি করি।

হাপুস্ হয়ে কেঁদে নেয়ে পেঁয়াজ কুঁচিয়ে উঠি। উঠে চোখ মুছে প্যানের ফুটন্ত জলে সেই কুঁচানো পেঁয়াজদের জলাঞ্জলি দিই। দিয়ে আবার চোখ মুছি। এমন কি, ওই পেঁয়াজদের দশা ভেবে—ওদের জন্যও চোখে জল আসে আবার। কাঁদতে কাঁদতে বইয়ের পাতা ওল্‌টাই।

'এইবার কয়েকটা গোল আলু ওর মধ্যে ছুঁড়ে দাও। গোল আলুগুলো খোসা-ছাড়ানো হওয়া দরকার।"—বইয়ে বাংলায়।

সারা ভাঁড়ার ঘর আঁতি পাঁতি করে' খুঁজি, কিন্তু খোসা ছাড়ানো গোল আলু একটাও আমার চোখে পড়ে না। প্রত্যেক আলুর গায়েই খোসা লাগানো। অথচ বইয়ে লিখেছে, খোসা ছাড়ানো আলুই চাই। তা না হলে—অন্য আলু দিয়ে হবে না। কী মুস্কিল দ্যাখো দিকি? কী যে করি এখন!

সুশীলাদির বাড়ী ছুট্‌তে হয়। সুশীলাদি আমার রান্না বান্নায় ওস্তাদ। আলুপটলদের নাড়ীনক্ষত্র ওঁর নখাগ্রে—ওদের স্বভাব চরিত্রের সব রহস্য ওঁর জানা।

"দিদি, আমাকে গোটাকতক খোসা ছাড়ানো আলু দিতে পারো? ভারী দরকার। অথচ বাজারে কি কোথ্থাও পাওয়া যাচ্ছে না।"

বল্‌তেই সুশীলাদি হাস্‌তে হাস্‌তে তাঁর রান্নাঘর থেকে ঐ আলু আধ ডজন আমার হাতে তুলে ছান্। আমিও আর দ্বিরুক্তি না করে' দৌড়তে দৌড়তে ফিরে আসি। এসে দেখি সারা প্যান্ দিব্যি আনন্দে টগ্‌বগ্‌ করছে! গন্ধ ভুর্ ভুর্!

"এবার আলুগুলো ওর ভেতরে ছুঁড়ে দাও।"

ছুঁড়ে দেবার চেষ্টা করি—কিন্তু একটার পর একটা, চারটেই তাক্ ফস্‌কে গেল দেখে—বাকী দুটোকে আর ছুঁড়ে না দিয়ে, এগিয়ে গিয়ে, প্যানের ভেতরে ছেড়ে দিই। পাক-প্রণালীর উপদেশের অন্যথা করা হোলো, অন্যায় হোলো বুঝলাম। কিন্তু কি করব, পাকা রাঁধুনির মত হাতের তাক্ যদি আমার না থাকে, (থাকা স্বাভাবিকও নয়,) তাহলে কি করা যায়? সবাই কি দূর থেকে তাক্ মাফিক ছুঁড়তে পারে?

"এইবার অল্প করে' গোলমরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দাও।"

অল্প করে' গোলমরিচের গুঁড়ো কখনো ছিটিয়েচ? ছিটিয়ে দেখেচ কী হয়? রান্নার কী হয় তা বল্‌চিনে, রাঁধুনির কী হয়, তাই আমার বক্তব্য। এক কথায়—হাঁচি হয়, দুর্দ্দান্ত রকমের হাঁচি। মশলার কৌটো ছিট্‌কে যায়—কোথায় যায়

জানা যায় না—খুনসুটি উড়তে থাকে—আত্মসম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

হাঁচির হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কোনোরকমে সাম্‌লে প্রায় তিনশো হাঁচি হাঁচার পর চোখ খুলতে পেরেচি—চেয়ে দেখি, পেঁয়াজের কারি প্যানের গলা ছাড়িয়ে উঠচে। আধ প্যানের বেশি জল দিইনি, অথচ তাই যে, এতক্ষণ ফুটেও কি করে' এক প্যান্ হয়ে উঠল—প্যান্‌টা নেহাৎ ছোট ছিল না তো —তাই দেখে আমার তাক্ লাগে। আর সেই কারির টগবগানি কি! কী তার লম্ফ ঝম্ফ! বইয়ের কথা তো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেচি, তব কোথায় যে কী গলদ ঘটল আমি বুঝি না।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই স্যুপ্ প্যান্ ছাপিয়ে ষ্টোভ্ ছেয়ে গেল। ষ্টোভ্ ছেয়ে উপ্‌চে পড়তে লাগল। আর অত উপচেও প্যান্‌ভর্ত্তি কারির কিছু কম্‌তি দেখা গেল না। আশ্চর্য্য কারি-কুরি! এবং এর ওপরে ফোঁস্ ফোঁসানিও তার যেন বেড়ে গেল আরো! আরো বেশি লাফাতে সুরু করে দিল আবার। আমাকে দেখেই কিনা কে জানে!

অবশেষে সেই স্যুপ—আগ্নেয়গিরির লাভাপ্রবাহের মত—ছড়িয়ে পড়তে লাগল ইতস্ততঃ। স্ততঃর মধ্যে আমাকে ধরা যেতে পারে। তীরবেগে ছুটে এসে আমার পায়ে ছ্যাঁৎ করে' লাগতেই আমি এক লাফ মেরেছি। আর তার পরেই পিছন ফিরে দে-ছুট্।

কিন্তু ছুট্ দিলে কি হবে, 'একশ গজের দৌড়ে' কোনো-দিনই আমি পুরস্কার পাই নি। সুপের সঙ্গে দৌড়েও আজ হেরে গেলাম। সুপ আমার আগে আগে যাচ্ছিল—তার গায়ে পা লেগে পেল্লায় এক আছাড় খেয়েছি। আর সেই এক আছাড়েই বিছানায় এসে আমি ধরাশায়ী। আমার ঘরের ওধার থেকে এধার পর্য্যন্ত—পেঁয়াজের কারি থই থই করছে—কোথাও পা ফেলার যো নেই—কিন্তু ভয় নেই আর—আমি এখন বিছানার ওপরে—যতই লাফাক্, য্যাতোদূর ওরা লাফিয়ে উঠতে পারবে না নিশ্চয়।

সুপের থেকে ভীত নেত্র সরিয়ে বইয়ের পাতায় রাখতেই চোখে পড়ল, সব শেষে লেখা আছে, "এইবার বারো জনের উপযুক্ত চমৎকার পেঁয়াজের সুপ বানানো হোলো।"





পরিহারির সত্যাজাত্!

টেলিফোন্‌টা ঝন্‌ঝনিয়ে উঠ্‌ল পাশের ঘরে। সবে মাত্র ভোর তখন,—বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে তখনো আমার বেশ খানিক দেরি। তার ওপরে কাল রাত্রে এক নেমন্তন্নে বেজায় খাওয়াদাওয়া হয়েছিল, বেশিই একটু, তখনো তার রেশ কাটেনি। সেই অসভ্য সময়ে টেলিফোনের ডাকে লেপের মায়া কাটিয়ে উঠতে হোলো।

"হ্যালো!" কণ্ঠস্বরটা একটু কড়াই হয়ে গেল বুঝি।

"হ্যা—লো!" নরহরির গলা কানে এলো। মিঠে হয়ে আর মোলায়েম হয়ে।

নরহরি উঠেচে এত সকালে! তাজ্জব্‌! কাল রাত্রে নেমন্তন্ন-বাড়ী এত বেশী ও খেয়েছিল যে নড়াচড়ার শক্তি ছিল না ওর। নড়ানো চড়ানোও শক্ত ছিল ওকে। পাতা থেকে তোল্লাতুল্লি করে' ওকে রিক্‌সয় ওঠানো হয়েছিল—এবং রিক্‌স থেকে এক রকম ধরে বেঁধে, যেমন করে' ক্রেন্‌ দিয়ে মাল তোলে তেমনি করে' ওর বাড়ীতে ওকে তুল্‌তে হয়েছে।

"ওহে শোনো!" বল্লে নরহরি: "এক বন্ধুকে আমি পাঠাচ্ছিলাম তোমার কাছে—তোমার সঙ্গে প্রাতরাশ করতে।"

"কার বন্ধু?" ঘুমের জড়তা ভালো করে' তখনো আমার কাটে নি।

"আমার—আবার কার? হরেকৃষ্ণ পতিতুণ্ডি, মোকাম জব্বলপুর। আজ সকালের গাড়ীতে পশ্চিম থেকে তাঁর

পৌঁছবার কথা। এই এসে পড়লেন বলে'। আমাকে তো ভাই বিশেষ জরুরি কাজে একটু বর্দ্ধমানে যেতে হচ্ছে—এক্ষুণিই—কখন্ ফিরব—এমন কি কবে ফিরব তার স্থিরতা নেই। তোমার ওপরেই তাঁর দেখাশোনার ভার দিয়ে যেতে চাই। তোমার মত বন্ধু আমার আর কে আছে বলো?"

"দাঁড়াও দাঁড়াও! আমাকেও যে—" আমারো যে গন্তব্য স্থল ছিল একটা, সুদূরতরই ছিল আরো, কিন্তু চট্ করে' সেটা আর মনে আসতে চায় না। আর সেই ফাঁকে নরহরি বাধা দিয়ে বলে' ওঠে: "জিওমেট্রি পড়েচ ত? মনে আছে নিশ্চয়? এ ফ্রেণ্ড্ টু ইজ্ এ ফ্রেণ্ড টুআদার্ ফ্রেণ্ড্ আর্ অল্ ইকোয়্যল্ টু ওয়ান্ অ্যানাদার্। অ্যাংগল্ ট্যাংগল্ দিয়ে ওই রকম কী একটা বলে না জিওমেট্রিতে? সে হিসেবে হরেকেষ্টকে তোমার আপন বন্ধু বলেও গণ্য করতে পারো। আমার আপত্তি নেই।"

কিন্তু আমার আপত্তি ছিল। কিন্তু সে কথা ভাষায় প্রকাশ করার আগেই নরহরি চেঁচাতে থাকে: "ভালো কথা, তোমাকে জানানো দরকার। আমার বন্ধুটি হচ্ছেন পাক্কা নিরামিষাশী—এক নম্বরের গোঁড়া যাকে বলে। তাঁর পাতের গোড়ায় আমিষ কোনো দ্রব্য দেয়া দূরে থাক্—মাছ মাংসের কথাই তাঁর কাছে তুলো না। ভয়ঙ্কর প্রাণে আঘাত পাবেন তাহলে। আর হ্যাঁ, দেখা শোনার ভারই কেবল নয়, দেখানোর শোনানোর ভারও থাক্লো তোমার ওপর।

কলকাতার যা কিছু দ্রষ্টব্য আর জ্ঞাতব্য আছে—যে ক'দিন তোমার ওখানে থাকেন, থাক্‌তে চান্‌ স্বেচ্ছায়, সেই সব দেখিয়ে শুনিয়ে এখানে ওখানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে বেড়াতে দ্বিধা কোরো না। আচ্ছা, আসি। ট্রেন ধরার সময় হয়ে এল আমার। তাঁর ট্রেন আর আমার ট্রেন এক সঙ্গেই ধরতে হবে কিনা! হাওড়ার প্ল্যাটফর্ম্ম থেকেই তাঁকে তোমার ঠিকানায় রিডিরেক্ট্‌ করে' দিয়ে তবে আমার বর্দ্ধমানের গাড়ী ধরা। আচ্ছা আসি। কিছু মনে কোরো না ভাই।"

মনে কত কিছুই না করি, না করে' পারি না। মনের কোনো দোষ নেই, বন্ধুর মন হলেও মানুষের মন তো! সামনে পেলে নরহরিকে চিবিয়ে খাবার ইচ্ছাও মনে হয়। আগের রাত্রের ওই ভূরিভোজনের পর কারো বন্ধুর সঙ্গে অত সকালে প্রাতরাশ করতে আদৌ আমার মেজাজ ছিল না, কিন্তু নরহরিকে পাল্‌টা টেলিফোন্‌ করতে গিয়ে আর তার পাত্তা নেই। অগত্যা, চট্‌পট্‌ হাতমুখ ধুয়ে, প্রাতঃকৃত্য সেরে, কাপড় চোপড় বদ্‌লে তৈরী হয়ে পড়তে হোলো। হরেকেষ্ট বাবু কখন্‌ এসে পড়েন বলা যায়না; হয়তো সূর্য্যের আগেই তাঁর উদয় হবে পশ্চিম দিক থেকে।

এবং কেবল প্রাতরাশই নয়। সারাদিন ধরেই কলকাতার চারধারে তাঁর সঙ্গে রাসলীলা করে' বেড়াতে হবে। আর ট্রামে বাসেও আজকাল যা রাশ্‌ তা কহতব্য নয়। পদব্রজে ব্রজলীলা করতে হলেই আমার হয়েছে।

বিষাক্ত মনে এই সব ভাবছি এমন সময় সদর দরজার কড়া-আওয়াজ কানে এল। দৌড়ে গিয়ে কপাট খুলতেই নরহরির বন্ধু ভজহরি—আই মীন্—হরেকেষ্টকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখলাম। জাব্বাজোব্বা আঁটা, জব্বলপুরের আমদানি - দেখ্লেই বোঝা যায়।

"আপনি?... ও আপনিই!" ভদ্রলোকের গদ্গদ কণ্ঠ: "কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব জানিনা। আপনি আমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে যে কী বিপদ থেকে আমায় বাঁচিয়েছেন কী বল্ব! নরুটা কী এক তাড়ায় কোথায় যেন চলে গেল কবে ফিরবে কে জানে।"

"যাক্ গে, যেতে দিন্। আপনি আমাকেই আপনার নরুর তুল্য বিবেচনা করবেন। নরু আদৌ না ফিরলেও আমার কোনো দুঃখ নেই। বরং আর সে না ফিরুক! আপদ গেলেই বাঁচি!....তবে আপনাকে দেখে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে, কী বল্ব! দয়া করে' পায়ের ধূলো দিয়ে ভেতরে আসুন, আপনার প্রাতরাশ প্রস্তুত। একটু জলযোগ করে' নিন্ আগে। আপনি চা খান্ তো চা না কফি না কোকো? কী?"

"স্রেফ্ দুধ।" বলতে গিয়ে ভদ্রলোককে যেন একটু দ্বিধান্বিত দেখা গেল: "মানে প্রাতরাশের কথাই বল্ছি। নইলে অন্য অন্য সময়ে অন্যান্য জিনিষ খাই।" ঢোঁক গিলে তিনি বল্লেন।

"আজ্ঞে, আমিও তাই। দুধের দ্বারাই আমার প্রাতঃ-কালীন জলযোগ। দুধের মতো জিনিষ আছে? মানে, জলীয় জিনিষ।"

চাকরকে ডেকে বলে দিলাম—পোচ্ নয়, ওম্‌লেট্ নয়, মাছ ভাজা নয়,—শুদ্ধু দু গ্লাস দুধ—চা ফা কিছু না। টোস্‌ট্? টোস্‌ট্ কি আমিষ বস্তুর মধ্যে ধর্ত্তব্য? কে জানে, কাজ নেই! সন্দেহবশে টোস্‌ট্ও বাদ দেওয়া গেল। অকারণে কারো প্রাণে আঘাত দিতে আমার ভালো লাগে না।

দুধের গ্লাস নিঃশেষ করে হরেকেষ্টবাবু বিচ্ছিরি এক ঢেঁকুর তুল্‌লেন। এক নিশ্বাসে যেমন কোঁৎ কোঁৎ করে' সবটা গিলে ফেল্লেন দেখলে অবাক্ হতে হয়। কেবল নিরামিষাশী বল্লে এঁকে কম করে' বলা হয়, কিছুই বলা হয় না,—আসলে ইনি ঘোর নিরামিষাসক্ত।

কিন্তু আমি তো আর অতটা শক্ত নই, অমন শক্তি রাখিনে, কাজেই, পাঁচন যেমন করে' গেলে মানুষ, তেম্‌নি করে' একটু একটু করে' এক আধ ঢোঁক্ গিল্‌ছি, এত কায়ক্লেশে যে কী বল্‌ব!

"আপনি সত্যিই একজন নিরামিষের ভক্ত বটে, স্বচক্ষেই তো দেখতে পাচ্ছি। এযুগে এরকমটি দেখতে পাব, কোথাও যে এ জাতীয় কেউ এখনো কেউ টিকে আছে তা আমার আশা ছিল না। কিন্তু না—দেখলে আনন্দ হয়! যেমন করে' রসিয়ে রসিয়ে অমৃতের মত এক এক চুমুক মারছেন—নাঃ,

সত্যি, আপনি দুগ্ধরসিক বটে !” হরেকেষ্টবাবু বিগলিত হয়ে বল্লেন।

উচ্চ প্রশংসালাভ করে’ দুধে বিতৃষ্ণা আমার আরো যেন বেড়ে গেল। পেটের ভেতরে কাল্‌কের রাতের মাংসেরা “ব্য ব্যা—অর্‌র্‌র্‌র্‌—কোক্‌কোর কোঁ !” নিজের নিজের জাতীয় ভাষায় আলাপ লাগিয়ে দিয়েছে মনে হলো। আমি গেলাস নামিয়ে রাখলাম।

“দুধ খায় বাছুরে !” আরেকটা বিচ্ছিরি ঢেঁকুর তুলে মুখ বিকৃত করলেন হরেকেষ্টবাবু।

“য়্যাঁ ?” আমার চমক লাগল হঠাৎ।

“না, না। আমি আপনাকে মীন্‌ করিনি। আপনার প্রতি কটাক্ষ করে’ কিছু বল্‌ছিনে।” তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লেন তিনি : “আসলে গোরুর দুধ তার নিজের বাছুরের জন্যেই সৃষ্টি তো ? তাই নয় কি ? সেই কথাই আমি বল্‌ছিলাম।”

“তা যা বলেন ! আপনার আসার আগেই আমার আরেক গ্লাস হয়ে গেছে কিনা, পেটে আর জায়গা নেই।” এই বলে’ বাকী দুধের দিকে আমি আর দৃক্‌পাত করিনে, গেলাস ছুঁইনে আর।

“আহা খেলেন না ! যতটুকু দুধ ততটুকুই রক্ত যে !” তাঁর আক্ষেপ হতে থাকে।

“রক্ত জলকরা। কলকাতার দুধ কিনা।” আমি বলি। “রক্ত একেবারে জলবৎ—না খেলেও তেমন ক্ষতি নেই।”

দুগ্ধগ্রাস থেকে মুক্তিলাভ করে' আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কলকাতার রাস্তায় ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হয়ে বেড়াতে লাগলাম। পথে-বিপথে চার দিকেই কতো রেস্তরাঁ কাফে আর কেবিন্—কিন্তু সবখানেই তো মৎস্য-মাংসঘটিত ব্যাপার—কোথাও পা দেবার যো নেই। তার ওপরে নিরামিষ আহারের উপকারিতার বিষয়ে হরেকৃষ্ণবাবুর বক্তৃতা শুনতে শুনতে চলেছি।

অগত্যা তাঁর সহানুভূতি আকর্ষণ করতে আমিষ-আহারের বিষময় ফল নিয়ে আমিও কিছুকিছু বল্লাম। আমিষ হজম করতে যে পরিমাণ শক্তি যায় ঐ খাদ্য হতে সে পরিমাণ শক্তি আসে না, তার ফলেই আমিষাশীরা অল্প দিনে মারা পড়েন। এক কথায় আমিষ খাওয়া আর খাবি খাওয়া এক। (অবিশ্যি, নিরামিষাশীরা বহুকাল বেঁচে থাকেন, কিন্তু মাছ মাংস ছেড়ে দিয়ে কিসের আশাতেই বা তাঁরা বাঁচেন? কোন্ সুখেই বা, আমি তাই ভাবি!)

কিন্তু মুস্কিল হোলো খাওয়া নিয়ে। কী যে তাঁকে খাওয়ানো যায় আর কোথায় বা খাওয়াবো! সত্যি, কোথায় যে খাওয়া দাওয়া করি! মৎস্য-মাংসবিবর্জিত একটাও পাকস্থলী তো (না কি, পাকস্থল?) কলকাতায় নেই—অন্ততঃ জানাশোনার মধ্যে নেই। কোথায় আমাদের নিয়ে যাই?

অবশেষে, ভেবে দেখলাম ফলমূলই প্রশস্ত। মূল কোথায় মেলে জানিনা, মূলোর বাজারেই হয়তো বা, কিন্তু ফল

তো সর্ব্বত্র। প্রায় সব রাস্তার মোড়েই ফিরিওয়ালার হেফাজতে ছড়ানো রয়েছে ফল। ছড়ানো এবং ছাড়ানো ঃ বাতাবি নেবু, কমলা, কলা আর পেঁপে। আনারসেরও অভাব নেই! পয়সা ফেল্লেই পাওয়া যায়। তাই খাওয়া যেতে লাগল। হরদম্—যখন তখন—দুজনে মিলে।

সারা দুপুরটা এইভাবে ফলবান হয়ে—লক্ষ্মণ আর গাছ-পালার মত বারম্বার ফল ধরতে বাধ্য হয়ে বিকেলের দিকে হরেকেষ্টকে একটু যেন ব্যাজার দেখা গেল। 'ফল খায় বাদরে' এই ধরণের একটা মন্তব্যও যেন ফস্‌কে এল তাঁর মুখ থেকে। অবিশ্যি, সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুদ্ধিপত্রে প্রকাশ করে' দিলেন—আমাদের নিজেদের প্রতি কোনো অবজ্ঞা তিনি দেখাচ্ছেন না। আসলে, ফল তো গাছেই ফলে, আর বাঁদরদেরও গাছেই বসবাস তো—কাজেই প্রথম ফলাওয়ের মুখে তাদের বরাতেই ফললাভ ঘটে থাকে।

আমি বল্লুম ঃ "মা ফলেষু কদাচন। তাহলে আর ফলার করে' কাজ নেই। খুব হয়েছে।" মনে মনেই বল্লুম যদিও।

এখন বৈকালিক জলযোগ কি করা যায়? এক পাঞ্জাবী দোকানে গিয়ে দু গ্লাস—বেশ বড় বড় দুগ্লাস—লস্যি নেওয়া গেল। সেই ঘোল না খেয়ে হরেকেষ্টবাবু ঘাল্ হয়ে পড়লেন অনেকক্ষণ পরে দম নিয়ে তিনি বল্লেন ঃ "ঘোল খায় যতো বোকায়।" বলে' তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লেন।

"কেন, খেতে কি ভালো না? আমার তো খাসা লাগ্‌লো।"

"খাসা বইকি! খুবই চমৎকার! খেয়ে খুব তৃপ্তি পেয়েছি,তা বলাই বাহুল্য। আমাদের আমি বোকা বল্‌ছি তা ভাববেন না। বোকারা ঘোল খায় বলে' একটা কথা ছিল না? কথাটার মানে কী, তাই আমি ভাবছিলাম।"

দুধের যত প্রকার অপভ্রংশ হতে পারে তার মধ্যে ঘোলটাই যে একমাত্র নয়—তা ছাড়া ছাতার বাঁট্‌ও আছে--তবে ঘোলটাই সবচেয়ে অম্লমধুর আর বেশ সুস্বাদুও—বৈজ্ঞানিকের মতো আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করি। দুধের ছানা-অংশ থেকে ছাতার বাঁট্‌ হয়ে থাকে একথা শুনে হরেকেষ্টবাবু তো হাঁ হয়ে গেলেন। বল্লেন, "ছাতার বাঁট কিন্তু তেমন সুস্বাদু নয়। আমি শিশুকালে খেয়েছি মশাই, এখনো আমার মনে আছে।"

"অবশ্যি, ঘোল যেমন পেটে লাগে ছাতার বাঁট্‌ তেমন নয়। ওকে বরং পিঠে লাগানো যায়।" আমি অনুযোগ করি। এবং পরবর্ত্তী সুযোগে নরহরি আর ছাতার বাঁটকে দ্বন্দ্বসমাসে নিয়ে আসা যায় কিনা মনে মনে ভাবি।

সমস্ত দর্শন-প্রদর্শন সমাধা করতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। ক্লান্ত হয়ে পড়লাম আমি। হরেকেষ্ট বল্লেন আর একটা জায়গা দেখলেই তাঁর হয়ে যায়। গুলুওস্তাগরের গলির যে বাড়ীর একতলায় তিনি জন্মেছিলেন সেইখানটা।

তাঁর সেই সাধটাই বা না মেটে কেন? ঠিকানা বাৎলে সেই জন্মস্থানে তাঁকে নিয়ে গেলাম। খুব বেশি খোঁজাখুঁজি

করতে হোলোনা। কিন্তু জায়গাটা দেখে হরেকেষ্টবাবু অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। সেই একতলাটা এখন একটা চপ্ কাট্‌লেটেব দোকানে পরিণত হয়েছে দেখা গেল।

"ভেতরে গিয়ে দেখবার ইচ্ছা ছিল একবার; কিন্তু—কি দুঃখের বিষয়—" ভগ্নকণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করলেন।

"আসুন না, যাওয়া যাক্। দেখতে দোষ কি? না খেলেই হোলো।"

ভেতরে গেলাম আমরা এবং একটা টেবিল নিয়ে বস্‌লাম—ঠিক যেখানটিতে হরকেষ্টবাবু স্বর্গচ্যুত হয়ে ইহলোকে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন সেইখানে। দুটো লেমোনড্ নিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করা গেল।

কেবল চপ কাটলেটই নয়, সব কিছুই ছিল হোটেলটায়। মাংসের কারি, কোর্ম্মা, রোস্‌ট্, কাবাব, দোপেঁয়াজী, পোলাও পর্য্যন্ত। আর এমন খাসা গন্ধ ছেড়েছিল!

সেই গন্ধে তো আমার জিভে জল এসে গেল। আর হরেকেষ্টবাবুর (সেই গন্ধেই কিনা বল্‌তে পারি না) চোখ লাগল চক্ চক্ করতে।

কেন যে মানুষ এই সব ছাইপাঁশ খায়—এই যতো চপ্ কাট্‌লেট্! খেয়ে কী সুখ পায় জানিনে!" বল্লেন হরেকেষ্ট: "কি রকম খেতে কে জানে!"

'একটা নিয়ে চেখে দেখা যাক্ না কেন?" আমি বলি। বাস্তবিক্, অভিজ্ঞতা-অর্জ্জনে দোষ কি? সব রকমেরই

অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে হয়—আসক্ত হয়ে না পড়লেই হোলো। সেকথাও আমি বলি।

"আচ্ছা বেশ, অভিজ্ঞতালাভের জন্য সামান্য কিছু খেয়ে দেখা যাক্ নাহয়। একটা চপ্ আর একটা কাট্লেট—কি বলেন?" নিম্‌রাজি হলেন হরেকেষ্ট।

"নিশ্চয় নিশ্চয়। আরো গোটা দুই বেশি করে' নেয়া যাক্—আমিই বা কেন অভিজ্ঞতায় বঞ্চিত হই?" আমি সায় দিয়ে বল্লাম।

চপ্ কাট্‌লেট্ এসে পড়ল। হরেকেষ্ট বল্লেন—' ও জিনিষ আর হাত দিয়ে ছুঁতে চাইনে। ছুরি কাঁটা আছে?" ছুরি কাঁটাও এসে গেল। দুপ্রস্থই এল। দুজনেই আমরা অভিজ্ঞ হতে লাগলাম।

ওঁর ছুরি-কাঁটা-চালানোর কায়দা দেখে তো আমার তাক্ লেগে গেল। অবশেষে না বলে' আর পারলাম না: "কিছু মনে করবেন না হরেকেষ্টবাবু, নরহরির কথায় কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে। ঘোরতর সন্দেহ। সে আমাকে বল্ল যে আপনি নাকি মাছ মাংস স্পর্শও করেন না, কিন্তু ছুরি কাঁটায় আপনাকে যেরকম ওস্তাদ্ দেখছি—"

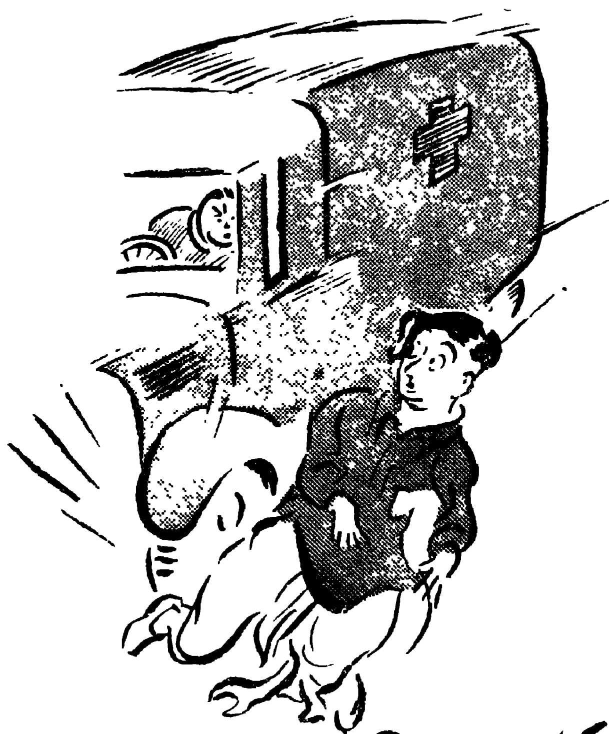
'নরহরি বল্ল?" হরেকেষ্টবাবু বাধা দিয়ে বল্লেন সবিস্ময়ে "নরহরি বল্ল এই কথা? আমি মাছ মাংস ছুঁইনে বল্ল সে? বরং মাছ মাংস ছাড়া আর কিছুই আমি ছুইনে। আপনিই নাকি নিরামিষের ভীষণ ভক্ত নরহরি আমায় বলেছে। আর

বলেছে যে মাছ মাংসের কথা কানে তুল্‌তেও প্রাণে আপনি ব্যথা পান। তা কি তবে সত্যি নয়—য়্যাঁ ?”

আর য়্যাঁ। তারপরে দুজনে মিলে নবহরির যা একখানা শ্রাদ্ধ করা গেল ! প্রাণ খুলেই করলাম। শ্রাদ্ধশান্তি সেরে তখন একধার থেকে চপ্‌ কাটলেট্‌, বোসট্‌, কারি, কাবাব, কোর্ম্মা, দোপেঁয়াজি, মাছের পোলাও, মাংসের পোলাও যা কিছু ছিল সেই হোটেলে, সব সেই টেবিলে এসে জড়ো হোলো। শ্রাদ্ধের পরে নিয়মভঙ্গে লাগা গেল প্রাণপণে।

এবং তারপরে ? খাওয়া দাওয়া শেষ হলে নকুর বন্ধু হকুকেও তোল্লাতুল্লি করে’ বিক্‌সয় টেনে তুলতে হোলো। ঠিক আগের রাতের নরহরিব মতই।

আমাকেই টানাটানি করতে হোলো—আমার অদৃষ্ট ! গুরু ভোজনের পরে গুরুতর পরিশ্রম আমার পোষায় না—কিন্তু কবব কি ? পতিতুণ্ডি মশাইকে তো গুলু ওস্তাগরের হোটেলে ফেলে আসা যায় না অধঃপতিত অবস্থায় ? নরহরি, যে আমার বন্ধু আর ইনি, যিনি নরহরির বন্ধু—ফলতঃ, উনি আর আমি এবং আমরা সবাই পরস্পব সমান এবং বন্ধুবৎ নই কি ? জিওমেটি তে কী বলে ? য়্যাঁ ?—



এক বেতার-ঘটিত দুর্ঘটনা!

অ্যাম্বুলেন্স চাপা পড়ার মত বরাত বুঝি আর হয় না। মোটর চাপা পড়া গেল অথচ অ্যাম্বুলেন্স আসার জন্য তর্ সইতে হোলো না—যাতে চাপা পড়লাম তাতেই চেপে হাসপাতালে চলে গেলাম। এর চেয়ে মজা কি আছে?

ভাগ্যের যোগাযোগ বুঝি একেই বলে। অবিশ্যি, ক্বচিৎ এরূপ ঘটে থাকে—সকলের বরাত তো আর সমান হয় না। অবিশ্যি এর চেয়েও—অ্যাম্বুলেন্স চাপা পড়ার চেয়েও, আরো বড়ো সৌভাগ্য জীবনে আছে। তা হচ্চে রেডিয়োয় গল্প পড়তে পাওয়া।

দুর্ভাগ্যের মত সৌভাগ্যরাও কখনো একলা আসে না। যখন আসে, এপিডেমিকের মতই আসে। রেডিয়োর গল্প আর অ্যাম্বুলেন্স্ চাপা—এই দুটো পড়াই একযোগে আমার জীবনে এসেছিল। সেই কাহিনীই বল্ছি।

কোন্ পূণ্যবলে রেডিয়োয় গল্পপাঠের ভাগ্যলাভ হয় আমি জানিনে, পারৎপক্ষে তেমন কোনো পুণ্য আমি করিনি। অন্ততঃ আমার সজ্ঞানে তো নয়, তবু হঠাৎ রেডিও অফিসের এক আমন্ত্রণ পেয়ে চমকাতে হোলো। আমন্ত্রণ এবং চুক্তিপত্র একসঙ্গে গাঁথা—দক্ষিণা পর্য্যন্ত বাঁধা—শুধু আমার সই করে' স্বীকার করে' নেওয়ার অপেক্ষা কেবল। এমন কি, রেডিয়োর কর্ত্তারা আমার পঠিতব্য গল্পের নামটা পর্য্যন্ত ঠিক করে' দিয়েছেন। "সর্ব্বমত্যন্তম্—!" এই নাম দিয়ে, এই শিরোনামার সঙ্গে খাপ খাইয়ে গল্পটা আমায় লিখতে হবে।

ত, আমার মত একজন লিখিয়ের পক্ষে এ আর এমন শক্ত কি ? আগে গল্প লিখে পরে নাম বসাই, এ না হয়, আগেই নাম ফেঁদে তারপরে গল্পটা লিখ্‌লাম। ছেলে আগে না ছেলের নাম আগে, ঘোড়া আগে না ঘোড়ার লাগাম আগে, কারো কারো কাছে সেটা সমস্যারূপে দেখা দিলেও একজন লেখকের কাছে সেটা কোনো প্রশ্নই নয়। লাগামটাই যদি আগে পাওয়া গেল, তার সঙ্গে ধরে বেঁধে একটা ঘোড়াকে বাগিয়ে আনতে আর কতক্ষণ ?

প্রথমেই মনে হোলো, সব আগে সৌভাগ্যে কথাটা শত্রু মিত্রনির্ব্বিশেষে সবাইকে জানিয়ে ঈর্ষান্বিত করাটা দরকার। বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। বন্ধু বান্ধব, চেনা আধচেনা, চিনি-চিনি সন্দেহজনক যাকেই পথে পেলাম, পাক্‌ড়ে দাঁড় করিয়ে এটা-সেটা একথা সেকথার পর এই রোমাঞ্চকর কথাটা জানিয়ে দিতে দ্বিধা করলাম না। অবশেষে পষ্ট পষ্ট করে' বলে দিলাম—"শুনো কিন্তু! এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার—সাড়ে পাঁচটায়—শুনে বল্‌বে আমায় কেমন হোলো।"

"শুনব বইকি! তুমি গল্প বল্‌বে আর আমরা শুনবো না, তাও কি হয় ? রেডিয়ো কেনা তবে আর কেন ? তবে কি না, রেডিয়োটা কদিন থেকে আমাদের বিকল হয়ে রয়েছে—কে যে বিগ্‌ড়ে দিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। গিন্নির সন্দেহ অবশ্যি আমাকেই—যাক্‌, এর মধ্যে ওটা সারিয়ে

ফেলব'খন! তুমি গল্প পড়ছ, সেটা শুন্‌তে হবে তো।"
একজনের আপ্যায়িত-করা জবাব পেলাম।

আরেকজন তো আমার কথা বিশ্বাসই করতে পারেন না:
"বলো কি? আরে, শেষটায় তুমিও! তোমাকেও ওরা
গল্প পড়তে দিলে? দিনকে দিন কী হচ্ছে কোম্পানীর!
আর কিছু বোধ হয় পাচ্ছে না ওরা—নইলে শেষে কিনা
তোমাকেও—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ! !—অধঃপাতের আর বাকী কি
রইলো হে? নাঃ, এইবার দেখবে অল্ ইণ্ডিয়া রেডিয়ো উঠে
যাবে, আর বিলম্ব নেই।"

বন্ধুবরের মন্তব্য শুনে বেশ দমে গেলাম—তথাপি আমতা
আমতা করে বল্লাম—"রেডিয়োর আর দোষ কি দাদা?
খোদার দান। খোদা যখন ছ্যান্ ছাপ্পর ফুঁড়ে দিয়ে থাকেন,
জানো তো? এটাও তেমনি আকাশ ফুঁড়ে পাওয়া—হঠাৎ
এই আকাশবাণীলাভ।"

"আচ্ছা, শুন্‌ব'খন। তুমি যখন এত করে' বল্‌ছ। অ্যাস্-
পিরিন্, স্মেলিং সল্ট—এসব হাতের কাছে রেখেই শুন্‌তে
হবে। তোমার গল্প পড়লে তো—সত্যি বল্‌ছি, কিছু মনে
কোরোনা—আমার মাথা ধরে যায়—শুনলে কী ফল হবে কে
জানে!" মুখ বিকৃত করে' বন্ধুটি জানিয়ে গেলেন।

তবু আমি নছোড়বান্দা। পথে ঘাটে যাদের পাওয়া গেল
না তাদের বাড়ী ধাওয়া করে' সুখবরটা দিলাম। কিন্তু কি
আশ্চর্য্য, উক্ত শুক্রবারে সেই মুহূর্ত্তে সকলেই শশব্যস্ত!

কারো ছেলের বিয়ে, কারো মেয়ের পাকা দেখা, কার আবার কিসের যেন এন্‌গেজ্‌মেন্ট, কাউকে খুব জরুরি দরকারে কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে। এম্‌নি কত কি কাণ্ডে সেই দণ্ডে সবাই বিজড়িত—রেডিয়োয় কর্ণপাত করার কারো ফুরসৎ নেই। কী মুস্কিল, দ্যাখো দেখি। আমি গল্প বলব কেউ শুনবে না। আমার জানাশোনারা শুন্‌তে পাবে না—এর চেয়ে দুঃখ আর কী আছে? আমার গল্পপড়ার দিনটিতেই যে সবার এত গোলমাল আর জরুরি কাজ এসে জুটবে তা কে জানত!

আর তাছাড়া, রেডিয়োর সময়টাতেই তারা কেন যে এত ভেজাল জোটায় আমি তো ভেবে পাই না। পূর্ব্বজন্মের তপস্যার পূণ্যফলে রেডিয়োকে যদি ঘরে আন্‌তে পেরেছিস্—তাই নিয়েই দিনরাত মশ্‌গুল্ থাক্—তা না।—অন্ততঃ প্রোগ্রামের ঘণ্টায় যে কক্ষনো কক্ষচ্যুত হতে নেই একথাও কি তোদের বলে' দিতে হবে? আর সব তালে ঠিক আছিস্ কেবল রেডিয়োর ব্যাপারেই তোরা আন্‌রেডি—সব তোদের উল্টোপাল্টা!

সত্যি, আমার ভারী রাগ হতে লাগল। অবিশ্যি, ওদের কেউই আমাকে আশ্বাস দিতে কসুর করল না যে যত ঝামেলাই থাক, যেমন করে' হোক, আমার গল্পটার সময়ে অন্ততঃ ওরা কান খাড়া রাখবে—যত কাজই থাকনা, এটাও তো একটা কাজের মধ্যে। বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য তো। এমন কি

কলকাতার বহির্গামী সেই বান্ধবটিও ভরসা দিয়ে গেলেন যে ট্রেন ফেল করার আগের মিনিট পর্য্যন্ত কোনো চুল-ছাঁটা সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে যতটা পারা যায় আমার গল্পটা শুনে তবেই তিনি রওনা দেবেন।

সবাইকে ফলাও করে' জানিয়ে ফিরে এসে গল্পটা ফলাতে লাগা গেল। "সর্ব্বমত্যন্তম্—" এর সঙ্গে যুতমতো, মজবুৎমতো একটা কাহিনীকে জুড়ে দেয়াই এখন কাজ।

কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল কাজটা মোটেই সহজ কাজ নয়। গল্প তো কতই লিখেছি, কিন্তু এধরণের গল্প কখনো লিখিনি। ছোট্ট একটুখানি বীজ থেকে নাকি বড় বড় মহীরূহ গজিয়ে ওঠে, লোকে বলে' থাকে। আমি নিজের চোখে কখনো দেখিনি বটে, তবে লোকের কথায় অবিশ্বাস করতে চাইনে। তবুও, একথা আমি বলব, যে গাছের বেলা তা হয়ত সত্যি হলেও একটুখানি বীজের থেকে একটাগল্পকে টেনে বার করে' আনা দারুণ দুঃসাধ্য ব্যাপার।

বলব কি ভাই, যতই প্লট ফাঁদি আর যত গল্পই বাঁধি, আর যত রকম করেই ছকতে যাই, কিছুতেই ওই "সর্ব্বমত্যন্তম্"-এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। একটা গল্প লিখতে গিয়ে ভাবতে ভাবতে একশটা গল্প এসে গেল, মনের মধ্যে গল্পের একশা, আর মনের মত তার প্রত্যেকটাই, কিন্তু নামের মত একটাও না।

ভাবতে ভাবতে সাত রাত্রি ঘুম নেই, এমন কি, দিনেও দু চোখে ঘুম আসে না। চোখের কোলে কালি পড়ে গেল আর মাথার চুল সাদা হতে সুরু করল। অর্দ্ধেক চুল টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেল্লাম—আর কামড়ে কামড়ে ফাউন্টেনের আধখানা পেটে চলে গেল। কত গল্পই এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এল আর গেল কিন্তু কোনোটাই ওই নামের সঙ্গে খাটল না।

তখন আমি নিজেই খাট্‌লাম—আমাকেই খাটিয়া নিতে হোলো শেষটায়।

শুয়ে শুয়ে আমার খাতার শুভ্র অঙ্কে—আমার অনাগত গল্পের অঙ্গে-পৃষ্ঠে-ললাটে কত কী যে আঁকলাম! কাগের সঙ্গে বগ জুড়ে দিয়ে, বাঘের সাথে কুমীরের কোলাকুলি বাধিয়ে, হনুমানের সঙ্গে জাম্বুবানকে জর্জ্জরিত করে' সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার!

সব জড়িয়ে এক ইলাহী কাণ্ড! কী যে ওই সব ছবি—তার কিচ্ছু বুঝবার যো নেই, অথচ বুঝতে গেলে অনেক কিছুই বোঝা যায়। গুহা মানুষেরা একদা যে সব ছবি আঁকতো, এবং মানুষের মনের গুহায়, মনশ্চক্ষুর অগোচরে এখনো যে সব ছবি অনুক্ষণ অঙ্কিত হচ্ছে, সেই সব অন্তরের অন্তরালের ব্যাপার! মানুষ পাগল হয়ে গেলে যে সব ছবি আঁকে অথবা যে সব ছবি আঁকবার পরেই পাগল হয়ে যায়। সর্ব্বমত্যন্তম্—ড্যাশ্—উইদিন্ ইন্‌ভার্টেড্ কমার শিরোনামার ঠিক নীচে থেকে সুরু করে' গল্পের শেষ পৃষ্ঠায় আমার নাম-স্বাক্ষরের ওপর

অবধি কেবল ওই সব ছবি—ওই পাগলকরা ছবি সব ! পাতার দুধারে মার্জ্জিনেও তার বাদ নেই—মার্জ্জনা নেই কোনোখানে।

তোমরা হাস্‌ছো ? তা হাসতে পারো। কিন্তু ছবিগুলো মোটেই হাসবার মতো নয়—দেখ্‌লেই টের পেতে। ওই সব ছবির গর্ভে যে নিদারুণ আর্ট নিহিত রইলো, আমার আশা, সমঝ্‌দারের সাহায্যে (রাঁচির বাইরেও তাঁরা থাকবেন নিশ্চয় !) একদিন তার তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হবে—হবেই—চিরদিন কিছু তা ছলনা করে' নিগূঢ় হয়ে থাকবে না। আমার গল্পের জন্য, এমন কি, আমার কোনো লেখার জন্য কখনো কোনো প্রশংসা না পেলেও, ওই সব ছবির খাতিরে খ্যাতি আমার আছেই—ওদের জন্য একদিন না একদিন বাহবা আমি পাবই। ওরাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে—আজকে না হলে আগামী-কালে—মানুষের দুস্বপ্নের মধ্যে অন্ততঃ—এ বিশ্বাস আমার অটল।

অবশেষে 'সর্ব্বমত্যন্তম্'-এর পরে ড্যাশের জায়গায় শুধু 'গর্হিতম্'—কথাটি বসিয়ে রচনা শেষ করে' আমার গল্পের সেই চিত্ররূপ নিয়ে নির্দ্দিষ্ট দিনক্ষণে রেডিয়ো ষ্টেশনের দিকে দৌড়ালাম।

ভেবে দেখ্‌লে সমস্ত ব্যাপারটাই গর্হিত ছাড়া কি ? আগাগোড়া ভালো ক'রে ভেবে দেখা যায় যদি, আমার পক্ষে রেডিয়োর গল্প পড়তে পাওয়া, এবং যে দক্ষিণায় গল্প বেচে থাকি, সেই গল্প পড়তে গিয়ে তার তিনগুণ দাক্ষিণ্যলাভের

সুযোগ পাওয়া দস্তুরমত গর্হিত বলেই আমার মনে হতে থাকে। এবং যে গল্প আমি চিত্রাকারে, মিকি মাউসের সৃষ্টি কর্ত্তাকে লজ্জা দিয়ে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে ফেঁদেছি তার দিকে তাকালে—না, না এর সমস্তটাই অত্যন্তম্—অতিশয় অত্যন্তম্—এবং কেবল অত্যন্তম্ নয়, অত্যন্তম্ গর্হিতম্!

তারপর? তারপর সেই গল্প নিয়ে হন্যে হয়ে যাবার মুখে আমার দুনম্বর বরাত এসে দেখা দিল। আমি অ্যাম্বুলেন্স চাপা পড়লাম।

হাসপাতালে গিয়েও, হাত পা ব্যয় না করে' নিজে বাজে খরচ না হয়ে, অটুট অবস্থায় বেরিয়ে আসাটা তিন নম্বর বরাত বলতে হয়। কিন্তু সশরীরে সর্ব্বাঙ্গীণরূপে লোকালয়ে ফিরে এসে ভাগ্যের ত্র্যহস্পর্শের কথাটা যে ঘটা করে' যাকে তাকে বলবো, বলে' একটু আরাম পাবো তার যো কি! যার দেখা পাই, যাকেই বল্‌তে যাই কথাটা, আমার সূত্রপাতের আগেই সে মুক্তকণ্ঠ হয়ে ওঠে:

"চমৎকার! খাসা! কী গল্পই না পড়লে সেদিন! যেমন লেখায় তেম্‌নি পড়ায়—লেখাপড়াতে যে তুমি এমন ওস্তাদ্ তার পরিচয় তো ইস্কুলে কোনোদিন দাওনি হে! সব্যসাচি যদি কাউকে বলতে হয় তো সে তোমায়! আমাদের সবাইকে অবাক্ করে' দিয়েছ, মাইরি!"

আমিও কম অবাক্ হইনে। প্রতিবাদ করতে যাব, কিন্তু হাঁ করবার আগেই আরেকজন হাঁ হাঁ করে এসে পড়েছেন ঃ

"তোমার গল্প অনেক পড়েছি! ঠিক পড়িনি বটে, তবে শুন্‌তে হয়েছে। বাড়ীর ছেলেমেয়েরাই গায়ে পড়ে শুনিয়ে দিয়েছে। শোনাতে তারা ছাড়েনা—তা সে শোনাও পড়ার মতই! কিন্তু যা পড়া সেদিন তুমি পড়লে তার কাছে সে সব কিছু লাগে না। আমার ছেলে মেয়েদের পড়াও না। হ্যাঁ, সে পড়া বটে একখান্। আহা, এখনো যেন এই কানে—এইখানে লেগে রয়েছে হে!"

তাঁর মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে বল্লেন আরেকজন ঃ "গল্প শুনে তো হেসে আর বাঁচিনে ভায়া! আশ্চর্য্য গল্পই পড়লে বটে! বাড়ী শুদ্ধ, সবাই—আমার দুধের ছেলেটা পর্য্যন্ত উৎকর্ণ হয়েছিল, কখন্ তুমি গল্প পড়বে! আর যখন তুমি আরম্ভ করলে সেই শুক্কুরবার না কোন্‌বারে—বিকেলের দিকেই না?—আমরা তো শুনবামাত্র ধরতে পেরেছি—এমন টক-মিষ্টি—ঝাল্-ঝাল্—নোন্‌তা গলা আর কার হবে? আমার কোলের মেয়েটা পর্য্যন্ত ধরতে পেরেছে যে আমাদের রামদার গলা!"

রামদা-টা গলা থেকে তুল্‌তে না তুল্‌তেই অপর এক ব্যক্তির কাছে শুন্‌তে হোলো ঃ "বাহাদুর, বাহাদুর! তুমি বাহাদুর! রেডিয়োর গল্প পড়ার চান্‌স্ পাওয়া সহজ নয়, কোন্ ফিকিরে কি করে' জোগাড় করলে তুমিই জানো! তারপরে সেই গল্প

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ওগ্রানো—সে কি চাট্টিখানি ? আমার তো ভাবতেই পা কাঁপে, মাথা ঘুরতে থাকে ! কি করে পারলে বলোতো ? আর পারা বলে পারা—অমন নিখুঁৎ ভাবে পারা—যা একমাত্র কেবল হাঁসেরাই পারে। আবার বলি, তুমি বাহাদুর !!"

তারাই আমায় তাক্ লাগিয়ে দিল। রেডিয়োর স্বর্গে যাবার পথে উপসর্গে আট্কে অ্যাম্বুলেন্স চেপে আধুনিক পাতালে যাওয়ায় অমন গালভরা খবরটা ফাঁস করার আর ফাঁক পেলাম না।





দ্বিতীয় আমি !

এটা হাসির গল্প নয়। করুণ গল্পও না, তোমাদের কাছে নয় অন্ততঃ। যদি কারো কাছে করুণ হয় তো কেবল আমার কাছেই।

খুব সম্ভব এটা ভূতের গল্প। এবং এই গল্পের এর ভূত বোধ হয় আমি। আমিই স্বয়ং। দশচক্রে নয়, নিছক নিজের চক্রান্তে!

সেদিনের সেই ঘটনার পরে সশরীরে আমি টিকে আছি একথা ভাবতে পারি না। মরে গিয়ে ভূত হয়ে এই নশ্বর জগতে বিচরণ করছি বলেই আমার সন্দেহ হয়। অবিশ্যি, আলোয় আমার ছায়া আর আয়নায় প্রতিচ্ছায়া পড়তে দেখা গেছে কিন্তু তাহলেও এখনো আমার ঐ দ্বিধা দূর হয় নি।

এবং মারা যাবার আগে হয়ত বা হবে না। তবে—আমি—আমি কি আবার মারা যাবো? হয় আমি কবে মরে গেছি নয় তো আমি অমরদের মধ্যেই গণ্য হয়ে রয়েছি। মারা যাবার পরে প্রায় সবাই তো অমর? কজন আর বেঁচে উঠে পুনরায় মরবার সুযোগ পায় বলো?

এখন আসল কথায় আসা যাক্—সেদিনের ঘটনাটা বলি।

বেশ কিছুদিন আগের কথাই। কলকাতার বড় ডাকঘরের কাছে একবার একটা সুড়ঙ্গ বেরিয়েছিল, তার খবর কি তোমরা কেউ রাখো? তোমাদের মধ্যে যারা বেশ বড়ো হয়েছো আর খুব ছোট বেলাতেও কাগজ পড়তে অভ্যস্ত ছিলে তাদের কারো

কারো হয়ত মনে পড়তে পারে। সেই সুড়ঙ্গ নিয়ে সেই সময়ে ভারী হৈ চৈ পড়ে গেছল।

জি-পি-ওর দিকে মুখোমুখি দাঁড়ালে ওর ডান ধারের যে কাষ্টম্ হাউস্‌টা এখন চোখে পড়ে সেইখানে আগে পুরণো কেল্লা বাড়ীটা ছিল। সিরাজদ্দৌলার আমলের বাড়ী। সেই বাড়ী ভেঙে এই কাস্‌টম্ হাউস্ গড়বার সময়েই এই সুড়ঙ্গটা বেরিয়ে পড়েছিল। মিস্ত্রী মজুররা শাবল-গাঁইতি দিয়ে গভীর করে' ভিৎ খুঁড়তে খুঁড়তে সুড়ঙ্গটাকে হঠাৎ বার করে' ফ্যালে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা বল্‌ছিলেন যে উক্ত সুড়ঙ্গের ঐ গুপ্ত পথেই নবাবের বেগমরা গঙ্গাস্নানে যেতেন—ওর আরেক মুখ আছে নাকি গঙ্গার দিকে। হয়ত বা গঙ্গাগর্ভেই এখন। যে সময়ে এই সব নিয়ে কাগজে কাগজে হট্টগোল চলছিল তখন কে ভেবেছে যে নবাবের বেগম না হয়েও আমাকেও ঐ পথে অচিরে গঙ্গাযাত্রায় যেতে হবে। আমিই কি ভেবেছিলাম!

দুয়েকদিনের মধ্যেই অবিশ্যি ঐ সুড়ঙ্গ বুজিয়ে ফেলা হয়, কিন্তু সেটা আমি চিরকালের মত চোখ বুজবার পরেই! ঐ সুড়ঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমিও যে কাষ্টম্ হাউসের কুক্ষিগত হয়ে গেলাম—কবরস্থ হয়ে রইলাম—সেকথা কি তখন কারো মনে হয়েছে? কোনো কাগজে কি বেরিয়েছিল সে খবর? হায়, কেউই তা জানেনা; অদ্য তারিখের আগে আমার এই মরণ-বৃত্তান্ত প্রকাশের পূর্ব্বে এই চরাচরের কেউ সেকথা জানতে পায়নি।

উল্লিখিত সুড়ঙ্গের আবিষ্কারের খবরটা তার আগের দিনের কাগজে পড়েছিলাম। সেদিনের সংবাদপত্র খুলে সব প্রথমে তারই এক ছবি দেখা গেল—চমৎকার এক সুড়ঙ্গীন ছবি। ঠিক এই সময়টায়ই টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল—ক্রিং ক্রিং ক্রিং—

টেবিলের ওপাশের রিসিভারকে হাত বাড়িয়ে করায়ত্ত করে' কানে আনলাম—"হ্যালো!"

উত্তর এল—"হ্যালো!" অবিকল আমার গলায়।

আওয়াজ শুনে চম্‌কে যেতে হোলো। কানের গলদ মনে করে' গলা ছাড়লাম ফের—"হ্যালো, কে তুমি?"

"আমি শিব্রাম্।" একেবারে আমার গলায় যেন আমারই প্রত্যুত্তর।

বন্ধুবান্ধব কেউ ছদ্মগলায় রসিকতা করছে ভেবে খুব হাসি পেল আমার।

"শিব্রাম্ তো বুঝলাম, কিন্তু বল্‌ছ কোথ্‌থেকে?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"ভারী বিপদে পড়েছি ভাই। সিরাজদ্দোলার সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে কথা বলছি এখন।"

তখন আর আমার বুঝতে বাকী থাকল না যে কণ্ঠকুশলী কোনো বন্ধুর নিতান্তই এটা সুড়ঙ্গ-রস। অকারণ আমার উৎকণ্ঠা-সৃজনের অপচেষ্টা।

"তা, ওখানে মরতে গেছ কেন? মরবার কি আর কোথাও

জায়গা ছিল না ?" জবাব দিলুম আমি।—"আর গেলেই বা কি করে' ওখানে ?"

"ঠাট্টার সময় নয়, আমার মৃত্যু আসন্ন।" অত্যন্ত কাতর-কণ্ঠে জানালো শিব্রাম্। সেই শিব্রাম্। আমার মত স্বরে হুবহু আমার ব্যঞ্জনা দিয়ে বল্‌ল।

কারো মৃত্যু আসন্ন দেখলে মনে ঘা লাগে। নিজেরই কি আর পরেরই কি! বিশ্বাস না হলেও জিগ্যেস করলাম ঃ "সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলো দেখি, কিছুই আমি ঠিক-ঠাওর করতে পারছিনা।" একটু কৌতূহলও যে না হয়েছিল তা নয়।

"সে সব কথা পরে বল্‌ব, অনেক বৃত্তান্ত, আমাকে বাঁচাও আগে এখন। সুড়ঙ্গে আমি আট্‌কা পড়েছি। বেরোবার পথ পাচ্ছিনে। আমার টর্চ্চের আলোও নিভে আসছে। সুড়ঙ্গের মুখ বুজিয়ে দিয়েছে কি না কে জানে! আমাকে যদি বাঁচাতে চাও তো এক মুহূর্ত্তও আর দেরী কোরো না—ঐ যা! নিভে গেল টর্চ্চটা! চারধারে অন্ধকারের ঘুট্‌ঘুট্টি···ওঃ! কে যেন আমার গলা চাপছে···আমার গলা··· এই অন্ধকার—"

বল্‌তে বল্‌তে আমার সেই নামান্তর—বিকল্প আমার আর্ত্তস্বর থেমে গেল হঠাৎ। তার টর্চ্চের সঙ্গে সঙ্গে তার এবং আমার টর্চ্চার (torture) থেকে রেহাই পেলাম।

ব্যক্তিটি যেই হোক্ সে যে চমৎকার পিলে-চমকানো

অভিনয় করতে পারে তার ত আর ভুল নেই! তার ওস্তাদিকে বাহবা দিতে হয়!···আমার মৃত্যু আসন্ন জেনে আমার নিজেরই হাসিই পেল এমন! আরে, অমি তো জলজ্যান্ত এখানে বর্ত্তমান, আজকের খবরের কাগজের সামনে, আমি আবার কি করে' অন্যত্র খরচ হয়ে যেতে পারি?

যাই হোক, সুড়ঙ্গটা আমার মনে বেশ কৌতূহল জাগিয়েছিল কালকের কাগজে বার্ত্তাটা পাবার পর থেকেই ওটা দেখবার আমার লালসা জেগেছে। আজকের ওর চিত্ররূপ দেখে অবধি আর আমি আত্মসম্বরণ করতে পারছিনে। গ্রহ কিনা কে জানে, কিন্তু আমার আগ্রহ বেড়ে গেছে দশগুণ। দেখেই আসা যাক্ না কেমন সুড়ঙ্গটা।

এক্ষুনি গিয়ে দেখলেই হয়। কত লোকই তো যাচ্ছে। যাচ্ছে না কি?

সে কথা সত্যি। গিয়ে দেখলাম বেজায় ভীড়। বিস্তর লোক সুড়ঙ্গের বাইরে দাঁড়িয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরে ভেতরের রহস্য চক্ষুগোচরের চেষ্টা করছিল। একটু ভেতরে গিয়ে দেখা যায় না? এই একটুখানি কয়েক হাত অন্ততঃ?

পাহারোলা কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। কিছুতেই সে যেতে দেবে না। এক পাও নয়। রবীন্দ্রনাথের মেয়ের মত 'যেতে নাহি দিব' মেজাজ। সে বল্ল, আজই এটা বুজিয়ে ফেলা হবে। এইএকটু বাদেই। আমি বল্লাম, আমি কি আর ভেতরে যাচ্ছি? এতই বোকা কি আমি? এই সামনে থেকেই—একটু

এগিয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরে চলে আসব এক্ষুনি। অনেক বলে' অনেক কয়ে' পাহারোলাকে খুসি করে' তো সুড়ঙ্গে ঢোকা গেল।

একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ ছেলের হাতে একটা টর্চ্চ ছিল—নগদ মূল্য দিয়ে কিনে সেটা নিলাম। আলো নাহলে দেখব কি ক'রে? কয়েক পা এগিয়ে কিন্তু দেখলাম, বেশ পরিষ্কার পথ। রসাতলের পথ বলে' আদৌ সন্দেহ হয় না। ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। হয়ত নবাবী ধনরত্নলাভের দুরাশায় সরকারপক্ষ থেকেই পরিষ্কাররূপে এটা পরীক্ষা করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই এর গর্ভে টেলিফোনের লাইন ও পাতা হয়েছে দেখলাম। আরো ভেতর পর্য্যন্ত চলে গেছে টেলিফোনের তার।

তবে আবার ভয় কিসের? মানুষ তো গেছে এর ভেতরে। সরকারী লোকরাই গিয়েছে। গেছে এবং ফিরেও এসেছে। আমারই বা শেষ পর্য্যন্ত দেখে শুনে ফেরৎ আসতে দোষ কি? সিরাজদ্দৌলার আমলে আমি সজীব ছিলাম কি না জানিনে, কেবল ত্রিকালজ্ঞরাই তা বলতে পারেন, কিন্তু এখন নিজের আমলে সিরাজদ্দৌলার কীর্ত্তি পেয়ে, হাতে নাতে পেয়ে, না দেখে ছেড়ে দেব কেন?

আস্তে আস্তে টর্চ্চ হাতে এগুনো গেল।

এঁকে বেঁকে কিছুদূর গিয়ে একটা ঘরের মত পাওয়া গেল। চোর কুঠ্রির মত অনেকটা। সুড়ঙ্গটা এইখানেই এসে শেষ

হয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। টেলিফোনের লাইনটাকে এখান পর্য্যন্ত টেনে আনা হয়েছিল।

কুঠ্‌রিটায় অদ্ভুত একটা কী গন্ধ, একটু-ক্ষণেই নেশা ধরিয়ে দেয় যেন। অনেক দিন—মাস—বছর কোনো এক-খানে এসে জমাট্‌ বেঁধে গেলে এম্‌নি গন্ধ ছাড়ে বোধহয়। ঘরের মাঝখানে মর্ম্মরের বেদীর মতো বাঁধানো তার একধারে আমি বস্‌লাম।

বস্‌তে বস্‌তেই কেমন ঘুম পেতে লাগল। কিরকম ক্লান্তি বোধ করতে লাগ্‌লাম। কোনো লোক যদি কয়েক শতাব্দী ধরে ক্রমাগত বেঁচে থাকে—অবশ্যি, থাকে না কেউ—তাহলে সে যেমন সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ একটা অবসাদ বোধ করে—বিষাদ আর অবসাদ যুগপৎ—সেই রকমের আশ্চর্য্য এক অনুভূতি ধীরে ধীরে আমাকে আচ্ছন্ন করতে লাগল।

কতক্ষণ ঐ ভাবে ছিলাম জানিনা। হঠাৎ চমক্‌ ভাঙতেই দেখলাম আমার টর্চ্চ প্রায় নিবু নিবু।

উঠ্‌তে গিয়ে দেখি শরীর অবশ, তবু উঠ্‌লাম কোনো-গতিকে। কিন্তু পথ কই? সুড়ঙ্গের বহির্মুখটা কোন্‌ দিকে ছিল মনে পড়ছেনা। টর্চ্চের ক্ষীণ আলোয় চারধারই তো বন্ধ দেখছি। তবে কি—তবে কি এর মধ্যেই সুড়ঙ্গের পথ ওরা বুজিয়ে দিয়েছে নাকি?

ভাবতেই আমার বুক কেঁপে উঠ্‌ল। কী সর্ব্বনাশ! য়্যাঁ—?

কিন্তু এখনো বোধ হয় সম্পূর্ণ সর্ব্বনাশ হয়নি। টেলি-ফোনের যন্ত্রটা তো এখনো রয়ে গেছে দেখছি—হাতের কাছেই তো আছে। টেলিফোনে হাঁক ডাক ছাড়া যাক্‌··· খবর পাঠাই বাইরে···নিজের বাড়ীরই কাউকে ডাকি···এখনই ভীত হবার কি আছে? ···এখনই কি?···এহেন এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যযুগে এত সহজে এমন অবলীলায় কখনো কারো জীবন্ত সমাধি হতে পারে না।

যতদূর সম্ভব শান্তভাবে রিসিভারটা হাতে নিয়ে নিজের বাড়ীর নম্বর চাইলাম······হ্যালো···

ডাকতে ডাকতেই সাড়া এলো···হ্যালো···

যাক্‌, সাড়া পেয়েছি যখন, তবে আর কি? বেঁচে গেছি তাহলে। এবারের মত বাঁচলাম! কিন্তু হঠাৎ আমার খট্‌কা লাগে। জবাবের আওয়াজটা আমার নিজের গলার মতো নয় কি?

কানের ভ্রম বোধ হয়।···এবারে ওধার থেকে প্রশ্ন এল—

"হ্যালো, কে তুমি?" প্রশ্নটা অবিকল আমার গলায়।

"আমি—আমি শিব্রাম।" জবাব দিলাম আমি। নিজের সম্বন্ধে আমার বিশেষ দ্বিধা ছিল, বরাবরই ছিল, কিন্তু এতটা দ্বিধাগ্রস্ত আমি কখনো হইনি।

"শিব্রাম্‌ তো বুঝলাম, কিন্তু বল্‌ছ কেথ্‌থেকে?" টেলি-ফোনের ওধার হতে জিজ্ঞাসা এল এধারে।

আমার ঘরে বসে' কে এমন করে' আমার সঙ্গে ছলনা

করছে? মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে এই দুঃসময়ে এমন রসিকতা ভালো লাগে না। সত্যি বল্‌তে, আমার কান্না পেতে লাগল।

আর্ত্ত কণ্ঠে আমি বল্লাম: "ভারী বিপদে পড়েছি ভাই। সিরাজদ্দৌলার সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে কথা বল্‌ছি এখন।"

হঠাৎ আমার মনে হোলো, সমস্তটাই মায়া নয়তো? আমি যদি এখানে, তাহলে আমার বাড়ীতে বসে' আমার মত ও কে তবে? ওখানের ওই-আমি যদি সত্যিই আমি হই—তাহলে এখানকার এই-আমি কে আবার? ভারী গোলমালে পড়ে গেলাম।

যথার্থই যদি উর্দ্ধ জগতে একজন আমি এখন বজায় থেকে থাকি তাহলে এখানে রসাতলগর্ভে এই আমি গোল্লায় গেলেই বা কি হয়? একজন আমি তো বেঁচেই রইলাম!

কিন্তু আমার মন না না করে' উঠল। আমার সমস্ত অস্তিত্ব—যার কোনোখানেই মায়া নেই—চিম্‌টি কাটলে সবখানেই যার লাগে—একথা ভাবতেই হাহাকার করে' উঠ্‌ল। হাঁ হাঁ করে' উঠ্‌ল যেন। না—না, আমাকে বাঁচ্‌তে হবে—এই আমাকেও। ওপরের ঐ আমি টিঁকে থাকা এ আমার কোনই সান্ত্বনা নয়, ও যদি সত্যিই আমি হই, তবুও। আমার নিজের মতে, এই আমিই সত্যি। পুরোপুরি আসল। এ ছাড়া আর কোনো-আমির অন্য কোনো অস্তিত্ব আর কোথাও থাকতে পারে না।

ফের আমার মনে হয়, বেশ, ঐ উর্দ্ধ লোকের আমি যদি সত্যিই আমি হই, অন্ততঃ আমার নিকটাত্মীয়ও হই, তাহলে সে কেন এখানে এসে এখন এই মৃত্যুগহ্বর থেকে আমাকে উদ্ধার করুক্ না! বাধা কি তার? নিজের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভে সুখীই হওয়া যাবে। পরস্পরের মুখোমুখি আসতে চক্ষুলজ্জা কিসের?

এদিকে আমার টর্চ্চের আলো নিভে আসতে থাকে। আর কয়েক মুহূর্ত্তই হয়ত! তারপর আর আমার পাত্তা পাওয়া যাবে না--ও-ও পাবে না, আমিও না। আমি পরিত্রাহি ডাক ছাড়ি···হ্যালো······বাঁচাও আমাকে। শীগ্‌গির এসো। সুড়ঙ্গে আমি আট্‌কা পড়েছি···বেরুবার পথ পাচ্ছি না।···আমার টর্চ্চের আলোও নিভে আস্‌ছে······কী অন্ধকার···উঃ···



প্রানকেষ্টর কাণ্ড!

কথায় বলে—কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। কিন্তু আমাদের প্রাণ-কেষ্টর বেলা তার অন্যথা দেখা যাচ্ছে। কীর্ত্তি করে' সে মারা যাবার দাখিল; ফাঁসি ঠিক না হলেও, নিজেকে ফাঁসিয়েছে যে, তার ভুল নেই। যে পথ দিয়ে লোকে ফাঁসি যায়—এবং তার চেয়ে কাছাকাছি আরো যেসব তীর্থক্ষেত্র—জেল হাজত ইত্যাদি বাস করে—সেই আদালতেই তাকে হাজির হতে হয়েছে।

কেন যে তার ধৈর্য্যচ্যুতি হোলো বলা যায় না, বাসে যেতে যেতে, মোটা সোটা এক মেমকে হঠাৎ সে এক চড় মেরে বসেচে। এবং তার ফলে,—আহত ব্যক্তিটি স্থূল বলে' নয়, মেম্ বলেই, বেজায় হুলুস্থুল পড়ে গেছে।

সবাই এসে বল্‌চে, "প্রাণকেষ্ট, এমন কাজ তুমি কেন করলে? এ কাজ তোমার উপযুক্ত হয়নি।"

প্রাণকেষ্টর কিন্তু কোনো জবাব নেই।

"তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছল না কি? নইলে হঠাৎ অমন ক্ষেপে ওঠবার কারণ?" জিগ্যেস করে একজন।

প্রাণকেষ্ট চুপ করে' থাকে।

"না কি—মেম্ তোমাকে মারতে এসেছিল বুঝি? তাই বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার খাতিরেই বোধ করি—?" আরেকজন সংশয় প্রকাশ করে: "নাকি কাম্‌ড়াতেই এসেছিল? কিন্তু মেম্‌রা তো সচরাচর কাউকে কিছু বলে না?"

প্রাণকেষ্ট রা কাড়ে না কোনো।